KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৬৪ আশ্বিন, ১৩৬৪ কার্তিক, ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 October, '58 (0.50) SAMAKALIN

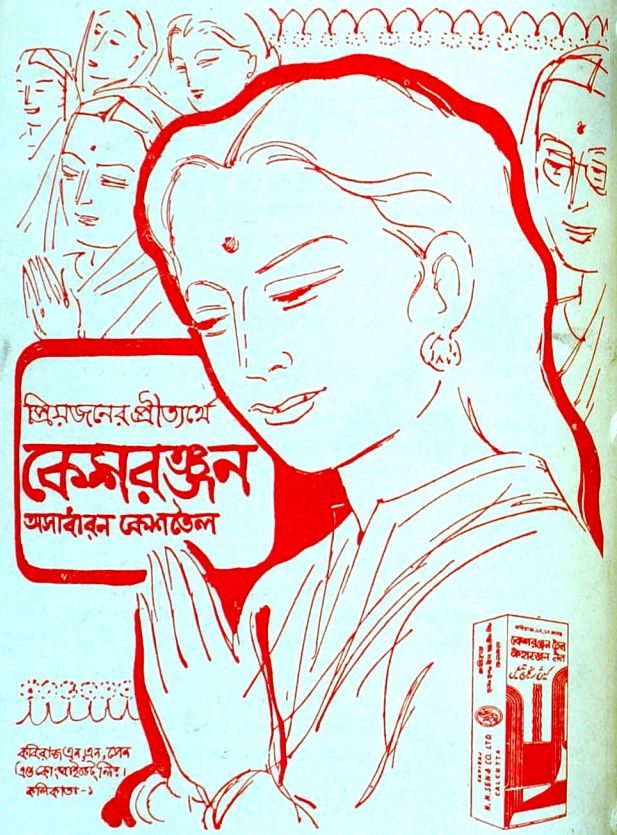

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ
কার্তিক ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

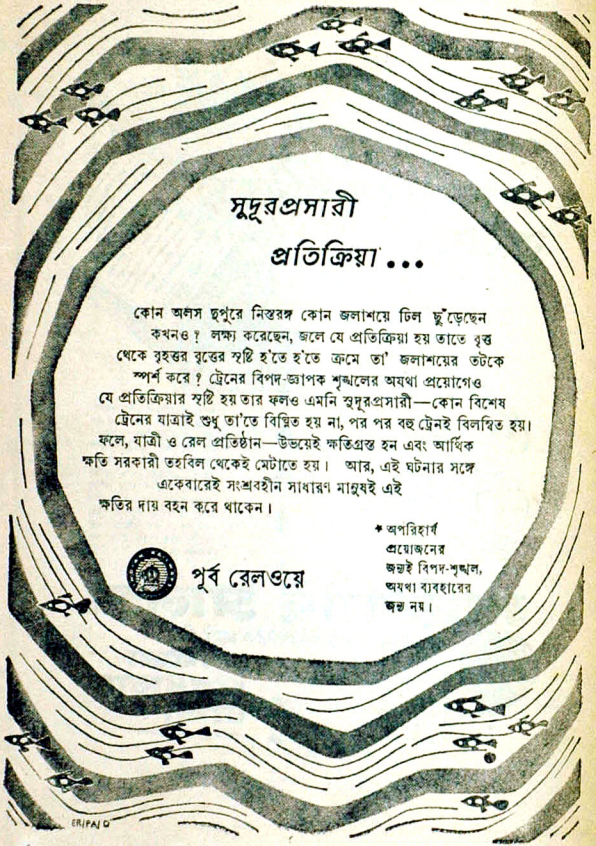

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৬৫

। সূচীপত্র ।

প্র ব ন্ধ ॥ বিশ্বপথিক বাঙালী কবি। শিশিরকুমার দাশ ৪২৫

ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ-মন। অলোক রায় ৪৩১

শিল্পকলা ও তার প্রতিরূপায়ণ। মীরা দত্ত ৪৩৯

অ নু স্মৃ তি ঃ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৪৪৪

উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৯

ক বি তা ॥ অনুবাদ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫৯

প্রেম। শিবশম্ভু পাল ৪৬০

আ লো চ না ॥ বাঙালীর প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব। সলিলপ্রসাদ ঘোষ ৪৬১

সং স্কৃ তি প্র স ঙ্গ ॥ বাঙলা সাহিত্য ও অনুবাদ। হরেন ঘোষ ৪৬৩

স মা জ স ম স্যা ॥ অরাজনৈতিক। সোমেন বসু ৪৬৬

স মা লো চ না ॥ মুরারি ঘোষ ৪৬৯ মঞ্জুলিকা বসু ৪৭১

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

...উনি সারাদিন ধরে কাগজ ছেঁড়েন!

উনি লোকটি কিন্তু ভয়ঙ্কর নন। ওঁর কাজই হচ্ছে কাগজের মোড়ক ছেঁড়া···এইভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উনি পরখ করে দেখেন যে জিনিষপত্রের কাগজের মোড়কগুলি যথেষ্ট মজবুত হোল কিনা।

হিন্দুস্থান লিভারে মোড়ক, টিন, কাগজের বাক্স এবং প্যাকিং বাক্স খুব ভালভাবে পরখ করে দেখা হয় যে এগুলো যথেষ্ট মজবুত হোল কিনা। কিন্তু শুধু তাই নয়। কাঁচা মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এবং কুশলী লোকেরা আমাদের জিনিষগুলি নানারকমভাবে যাচাই করেন। আমরা জানি যে হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য আপনারা মোটেই পছন্দ করবেননা। এইরকমভাবে পরখ করি বলেই আমরা জাতীয় সম্পদ বাঁচাতে পারছি—উৎপাদনের সময় কমাতে পারছি।

দ শে র সে বা য় হি ন্দু স্থা ন লি ভা র

HLL. 16-X52 BG

বিশ্বপথিক বাঙালী কবি

শিশিরকুমার দাশ

ঐতিহ্য কতকগুলি সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস নয়। ঐতিহ্য বলতে বোঝায় আমাদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনের সমস্ত আচার আচরণ থেকে আরম্ভ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্থ রীতিনীতির সম্মিলিত রূপ—যার দ্বারা আমরা একটি বিশেষ স্থানের বিশেষ গোষ্ঠিকে চিনতে পারি। এক ইংরেজ কবি সমালোচক একথা বলছেন। তিনি অন্যত্র আরো বলছেন ঐতিহ্য শব্দটি গভীর অর্থদ্যোতক। ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু পাওয়া যায়না, তাকে অর্জন করে নিতে হয় প্রবল পরিশ্রমে। প্রথমতঃ প্রয়োজন ঐতিহাসিক বোধ। ·· ঐতিহাসিক বোধ বলতে বোঝায় একটি ধারণা, অতীতের অতীতত্বকে শুধু অনুভব করাতেই তার শেষ নয়। অনুভব করতে হয় তার উপস্থিতি। এই ঐতিহাসিক বোধ জাতীয় ঐতিহ্যের নিবিড় পরিচয় গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়না—তাকে বৃহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রেরণা পায়। এই ঐতিহাসিক বোধ বা চিরন্তন ও অব্যবহিত কালের ধারণা এবং দুয়ের মিলিত রূপও বটে তাই লেখককে ট্রাডিশানাল করে বা ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সান্নিধ্য সৃষ্টি করে। .. এই ঐতিহাসিক বোধ কবিকে শুধু তাঁর সমকালীন সমাজের কথা লিখতে প্রেরণা দেয়না বরং এমন বোধ জাগায় যার সঙ্গে নিজের প্রাদেশিক সাহিত্য এবং হোমার থেকে সুরু করে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য জড়িত। সমালোচকের এই উক্তিটি যে কোন শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য সম্পর্কেই সত্য। মধুসূদন আলোচনা করার আগেই একথাটি স্মরণ করলাম। মধুসূদনের ইতিহাসচেতনার গভীরতা ও ব্যাপকতা দুই তাঁর মনের ও কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। মধুসূদন জাতীয় ঐতিহ্যকে এক অজ্ঞাত নিগূঢ় পূর্ব-জন্ম বাসনায় চিরকাল ভালবেসে এসেছেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্যে যে প্রেরণাই থাক অথবা হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর যে মনোভাব থাক তা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু সব চেয়ে স্মরণীয় যে যে দেশের বাতাস জল আকাশ আলোয় তাঁর মন গড়ে সেই শ্যামা জন্মভূমি তাঁর চিত্তলোকে বিরাট স্থান অধিকার করেছিল। আমাদের মধুসূদনের জীবন ও কাব্য থেকে কয়েকটি ঘটনা বা তথ্য লক্ষ্য করে মধুসূদনের এই ঐতিহ্য বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বালক বয়সে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, কবি কঙ্কণচণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থ পড়েছিলেন। সেগুলি তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সংগীতে তাঁর আসক্তি ছিল গভীর। তাঁর বিজয়া-

সংগীত খুব প্রিয় ছিল। মধুসূদন কিভাবে ব্যারিস্টারি করার সময়ও মামলার পরামর্শ নিতে আসা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সখীসংবাদ গান শুনতেন। কাব্য ও সংগীত ছাড়া তাঁর মনে আরেকটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কপোতাক্ষী সলিলবিধৌতা সুন্দর জন্মভূমি, নদীতীর নদী-তীরের গ্রামদেউল, ঝুরিনামা বটবৃক্ষ, সন্ধ্যেবেলার জোনাকীজ্বলা গ্রামপ্রান্তর, ভাঙ্গা শিবের মন্দির নদীতীরের গ্রামবধূ, জ্যোৎস্নারাত্রির আলোয় ঝলমল গ্রামকুটিরগুলি তাঁর মনে চিরজাগ-রূক ছিল। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, সংগীতে আসক্তি ও জন্মভূমির শোভা ছাড়াও আরো দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

'আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্যস্থানে তাম্বু গাড়িলাম'—এই বাংলা শুনে মধুসূদন হেসে উঠেছিল। মাদ্রাজে দেশীয়দের 'নেটিভ ম্যান' আর সাহেবদের য়োরোপীয় জেন্টলম্যান বলা হত বলে প্রতিবাদ করে এই অন্যায় বিদূরিত করেন। এই দুটি ঘটনা অত্যন্ত স্মরণীয়। মধুসূদন যেসময় এই বাংলা শুনে হেসে ছিলেন তখনই তিনিই মনে করতেন বাংলা ভুলে যাওয়াই ভালো। তখন তিনি বাংলা লেখার কথা কল্পনাও করেননি। গৌরদাস বসাকের নামের অক্ষরগুলি দিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনিই বলছেন যে এমন বাংলা শুনলে না হেসে পারা যায় না। বোঝা যায় যে ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে, বিশেষ করে তার গঠনরীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাঁর চিরদিন ছিল। আর দ্বিতীয় ঘটনা থেকে তার দেশপ্রীতিই প্রকাশিত হয়। উনিশশতকের জাতীয়তা বোধের—একটি প্রকাশ।

আর একটি ব্যাপার হল ইংলন্ড যাবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। তমলুকে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে তিনি ইংলণ্ডের কাছে পৌঁছে গেছেন। তিনি মাদ্রাজে গিয়ে ইংরেজি কাব্য আরম্ভ করলেন ক্যাপটিভ লেডি ও ভিসন্স অফ দি পাস্ট (অসম্পূর্ণ) লিখলেন। এইসময় তাঁর একটি মানসিক পরিবর্তন আসে। তখন তিনি আবার কাশীরাম কৃত্তিবাস পাঠ শুরু করেন। সে সময় এক চিঠিতে তিনি লিখছেন 'আমার দিনগুলি এখন ইস্কুলের ছেলের চেয়েও ব্যস্ত। আমার রুটিন দেখ : ৬টা থেকে ৮টা হিব্রু, ৮—১২ স্কুলে পড়াই, ১২—২ পর্যন্ত গ্রীক, ২—৫ পর্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫—৭ পর্যন্ত ল্যাটিন, ৭—১০টা ইংরেজি। আমি আমার মাতৃ ভাষাকে অলংকৃত করার জন্য কি প্রস্তুত হচ্ছিনা।' ১৮৫৫ খৃঃ এই কথা তিনি লিখছেন। ১৮৫৮ খৃঃ ৩১শে জুলাই শনিবার রত্নাবলী নাটক দেখতে গিয়ে নাটক লেখার সংকল্প জাগল। এবং ওরা সেপ্টেম্বর তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হল। তিনি বাংলা সাহিত্যে এবার পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করলেন।

এবার আমরা আসল কথাটিতে আসতে পারি। আধুনিক কালে আমাদের মনে একটি বিশেষ সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আজ যদি কেউ নিজেকে শুধু বাঙালী ভাবি তাহলে তাকে প্রাদেশিক আখ্যা দিই। নিজেকে শুধু ভারতীয় হিসেবে চিন্তা করতেও বাধে তাহলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায়। তাই আমাদের চেষ্টা বিশ্বনাগরিক হবার। অনেক সময় বাঙালিত্ব নিয়ে ঠাট্টা, ভারতীয়ত্ব নিয়ে উপেক্ষা এবং শেষপর্যন্ত এক নিরাসক্ত, বায়ুভূত বিশ্বমানবতার নামরূপহীনতার শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদর্শকেও দেখি। উনিশশতক থেকেই চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল যে বাংলাকে যন্ত্র হতে হবে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সংগে। রামমোহনের জীবনে তার পরিচয়। এসময় তাই বেদ উপনিষদের নূতন করে প্রচার হল, লোক্যাল দেবদেবী নিয়ে কাব্যালেখ্য আঠারো শতকেই শেষ হল। কবিদৃষ্টি প্রসারিত হল রাজপুতানা, উড়িষ্যা, কণোজে। শিল্পী-দৃষ্টি প্রসারিত হল ভারতবর্ষের শিল্পতীর্থে তীর্থে মন্দিরে, মসজিদে, গুহায়। রঙ্গলাল, মধুসূদন ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র সকলের দৃষ্টি হল ভারতমুখী। রবীন্দ্রনাথের ভাষার

ভারত-পথিক। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এখনও অজাত ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসের স্তিমিত প্রদীপ অধ্যায়ে। চিত্রকর দেশী, কিন্তু বিলাতী চিত্র-করের শিষ্য। তিনি এঁকেছেন রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব শকুন্তলা থেকে। হ্যাভেল সাহেব অনুপ্রাণিত অবনীন্দ্রনাথের শুভ শঙ্খধ্বনি করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের ন্যাশনালিজম বাংলা এবং ভারতবর্ষকে এককরার দিকে চলল। 'বন্দেমাতরম' গান বাংলাদেশেরই বন্দনা। কিন্তু তাকে ভারতবর্ষ মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানেই দেশপ্রেমের কথা লিখেছেন সেখানেই বাংলাদেশ চিহ্নিত। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই দেশপ্রেম বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে, হিন্দুত্ব আশ্রয় করেছে। যেমন সীতারামে খণ্ডগিরি উদয়গিরির শোভা দেখে বঙ্কিমের যে বক্তব্য তার মধ্যে। পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার স্পৃহা মূলত বাঙালীদের তথা ভারতীয়দের। সোজা কথায় উনিশশতকের জাতীয়তাবাদে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ এক হবার চেষ্টা করেছে—হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষময় প্রসারিত হয়েছে। মুসলমানরা দূরে সরে গেছে। বাঙালীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল তার স্বাতন্ত্র্যবিলাস। তাই এখানে আর্য-প্রভাব আসতে দেরি হয়েছে। মুসলমান আমলে বাংলাদেশ বিদ্রোহের জন্মভূমি হয়েছিল। ইংরেজ আমলের কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের সংগে বাংলাদেশের যোগ চিরদিনই একটু কমছিল। বাঙালীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশে সমস্ত দৃষ্টিই ললিত, কোমল, সূক্ষ্ম এবং ছোট। তার মধ্যে বৃহতের স্পর্শ কম। এক পাহাড়পুর ছেড়ে দিলে ভুবনেশ্বর বা দক্ষিণভারতের মত মন্দির নেই আমাদের। নটরাজের মত মহৎ ও দুঃসাহসী কল্পনা আমাদের নেই। বেদান্তের সংগে আমাদের যোগ কম। আমাদের যোগ ভাবধর্মের সংগে, দেহধর্মের সংগে। তাই উনিশশতকের সাধনাই ছিল বাংলা ও ভারতকে মিলিয়ে নেওয়া। সেই সংগে আর একটি প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। তা হল বিশ্বনাগরিক হওয়া। রামমোহনের মধ্যে এই চেতনার প্রথম উন্মেষ। দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি মুক্ত হলে তিনি কলকাতায় একটি ভোজ দেন। বিলেতে যাত্রার পথে কেপটাউনে ফরাসীদেশের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করেন। ফরাসীদেশে ভ্রমণের পাশপোর্ট না পেয়ে তিনি যে বিখ্যাত দরখাস্ত করেছিলেন তার মধ্যে বলেছিলেন 'all mankind are one great family'; তার মধ্যেই ইউ, এন, ও, বা লীগ্ অব্ নেশনস্-এর বীজ ছিল। মধুসূদনের মধ্যে সেই বিশ্ব-নাগরিকত্বেরই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথে তার পরিণতি। মধুসূদনকে তাই বিশ্বপথিক বাঙালি কবি বলা চলে।

আমরা মধুসূদনের কাব্য থেকে কিছু কিছু চিত্র বা উপমা সংগ্রহ করতে পারি। তার মধ্যে তাঁর মনের নানা সূক্ষ্মদিক, বিশেষ করে তাঁর বাল্যের যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছি তারই স্মৃতি সুরভি কিভাবে এসে ধরা পড়েছে তা দেখা যাবে। তার ভেতর থেকে তাঁর বাঙালি মনের রূপটি, যাকে আমার প্রথমে উল্লিখিত অংশের লেখক বলেছেন 'আমাদের ধর্ম ও সামাজিক জীব-নের সমস্ত আচার আচরণ থেকে আরম্ভ করে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যস্থ রীতি নীতির সম্মি-লিত রূপ—যার দ্বারা আমরা একটি বিশেষস্থানের বিশেষ গোষ্ঠিকে চিনতে পারি,—সেই রূপটি পাবো।

১ একাকিনী-বিরহিনী-বিষণ্ণবদনা
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে
(তি ১।১৯৩-৯৪)

২ বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা

৩ আহা মরি সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ।

৪ কৌটা খুলি; রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি ললাটে আহা তারা রত্ন যথা

৫ কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদপার্বণে
হর্ষমগ্ন বঙ্গষবে পাইয়া মায়েরে
চিরবাঞ্ছিতা

৬ রাক্ষসবধূ মৃগাক্ষী গঞ্জিনী
দেখিলা লক্ষ্মণবলী সরোবর কূলে
সুবর্ণ কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি —

৭ পরমযত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশি তলে বিসর্জিলা তাহে
ধৌতকরি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে

৮ বাজিছে মন্দির বৃন্দে প্রভাতী বাজনা
হায়রে; সুমনোহর বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য

এই উদ্ধৃতিগুলি কিছু ভেবে দিইনি। যেমন পাওয়া গেল হাতের কাছে তেমন ভাবেই দিলাম। এর মধ্যে থেকে একটি জিনিষ দেখা যায় মধুসূদনের চোখে বাংলাদেশ কী নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা দেশের শক্তি ও ভক্তির যে যুগ্মধারা প্রবাহিত, শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রাণের যে সম্মেলন তা মধুসূদনের মধ্যে। বৈষ্ণবপ্রাণের কাছে যমুনাতীর, রাধাবিরহ, মাধবশূন্য ব্রজধাম যে ঐতিহ্যময় তাকে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন আবার বাঙালী প্রাণে দুর্গোৎসব, দীপাবলী যে ধর্ম ও আনুষ্ঠানিকতার ধারা বহন করে আনে তাকেও গ্রহণ করেছেন। বাঙালী-মেয়েদের কটি ছবি মধুসূদন লক্ষ্য করেছেন। একটি সরোবর কূলে কলসীকক্ষে। অন্যটি অশোকবনে সরমার সিঁদুর পরানোর দৃশ্যে। আর একটি বিবর্ণা নারীর বিষাদ মূর্তি মধুসূদনের চোখে পড়েছে তুলসীর মূলে সন্ধ্যার প্রদীপের ছবি। কপোতাক্ষ তীরের গ্রামে তুলসীর মূলে এমন করে তিনি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালতে দেখেছেন কতদিন। সেই স্মৃতি মনে গাথা। মন্দিরের প্রভাতী বাজনা এখনও কানে বাজে। স্বর্ণলঙ্কার আকাশ বিজয়ার বিষাদে মেদুর। চতুর্দশপদীর মধ্যে এই বাংলার রূপ আরো সমগ্রভাবে আছে তার—অতীত ও বর্তমানের ধারা নিয়ে। কিন্তু অন্যান্য কাব্যের বিষয় কবির মন নয়, অন্য বস্তু। সেখানেও কবির মন আত্মপ্রকাশ করেছে এমনভাবে যে বাংলাদেশ একটি নিজস্ব প্রকৃতি নিয়ে ফুটে উঠেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা মধুসূদনের একটি মূল্যবান কবিতার দুটি পাঠ পেয়েছি। তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি স্মরণ করছি। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি লিখেছেন

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী
নিজগৃহে ধনতব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে

চারবছর পরে লিখেছেন

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখানি পূর্ণ মণিজালে॥

পরের পাঠটির শেষ দুটি ছত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম কবিতা যখন লিখছেন তখনও মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হয় নি। শুধু তাঁর নাটক প্রহসন ইত্যাদি, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রকাশ পেয়েছে। ফলে মাতৃভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠদান তিনি তখনও করেন নি। নিজেও বোধ করি সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তখন শুধু অনুভব করেছেন 'সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী'।

আর চার বছর পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুদূর ফ্রান্সে তখন তিনি প্রবাস বেদনায় ক্লিষ্ট। তখন তিনি লিখেছেন 'পাইলাম কালে মাতৃভাষা রূপখানি পূর্ণ মণিজালে॥'

আগেই বলেছিলাম মধুসূদন সেই কান্তারচারিণী কপালকুণ্ডলাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। সুদূর সমুদ্রপারে তরণীর গতি নির্দেশ করেও শেষপর্যন্ত তাই ফিরে এলেন কপোতাক্ষের কূলে। মনে হয় এবার যেন তাঁর কাব্যের বিষয় বাংলা দেশ—অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রকৃত বাংলা। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশপদী কাব্য বাংলার জীবনেরই একটি মহাকাব্যের খসড়া। কপোতাক্ষ তটভূমিতে দ্বাদশশিবের মন্দির, প্রাচীনবটের ছায়ার, দোলশ্রীপঞ্চমীর উৎসবমুখর গ্রামভূমি আশ্বিনের স্নিগ্ধ আকাশ, দূরে শান্তমধুকর গুঞ্জন, শতাব্দীর পুরাতন কৃত্তিবাস, কবি কঙ্কন ভারতচন্দ্রের স্মৃতিমুখর বাংলাদেশ। এমন করে বাংলাদেশকে ইতিপূর্বে আর কেউ দেখেন নি।

জননী ভারতীর কথা এইবার স্মরণ করি। মধুসূদন তাঁর ইংরেজি কাব্যে পুরুরাজ প্রসংগে বেদনার্দ্র হৃদয় স্মরণ করেছিলেন 'And where are thou fair freedom!thou
Once goddess of Ind's Sunny clime!

চিরজীবন সেই বেদনা তাঁর ছিল। জননী ভারতীর বর্ণনা দিয়েছেন

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে, যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসাগীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী

বন্দিনী জন্মভূমিকে স্মরণ করেছেন

আকাশ পরশী গিরি দমি গুণ বলে
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে
তাদের সন্তান কিহে আমরা সকলে
আমরা দুর্বল ক্ষীণ কুখ্যাত জগতে
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবন্ধ শৃঙ্খলে

উনিশশতকে সবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হচ্ছে। সবে ভারতবর্ষকে আমাদের দেশ বলে ভাবতে শিখেছি। ইটালির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে লোকে নিজেদের শহর নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মেকিয়াভেলির মত দার্শনিক কিংবা পেত্রার্কার মত কবি মাত্র ইটালিকে সমগ্রভাবে ভাবতে শিখেছিলেন। ষোড়শ শতকেও সেলিনী ফ্যোরেনটাইন্সদের শুধু 'আমাদের জাতি' বলে ভাবতেন, ফ্লোরেন্সকে বলতেন 'জন্মভূমি'। পেত্রার্কা উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করলেন হে আমার ইটালিআ। ভারতবর্ষেও মধুসূদনের কন্ঠেই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের রূপ ফুটে উঠল যথার্থভাবে। রেনেসাঁসের কাব্যগুলি গড়ে ওঠে জাতীয় জীবন থেকে। অস লুসিয়াদাস-এর কাব্যের প্রেরণা ডা গাবার অভিযান। ক্রুসেড থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেন আরিস্টো, তাসো। মধুসূদনও সেই জাতীয়তার কাব্য রচনা করলেন মেঘনাদবধকাব্য। চতুর্দশপদীকাব্য।

মেঘনাদবধকাব্যে প্রথমসর্গে সরস্বতীর আবাহনের সংগে মুসে-এর আবাহন মেলে। তাঁর কাব্যে কোথায় বাল্মীকি, কোথাও মিল্টন, কোথাও টাসো। কোথাও ডান্টে। ব্রজাঙ্গনায়

বৈষ্ণবকবিরা। বীরাঙ্গনায় ওভিড এবং বিভিন্ন ভারতীয় কবি। চতুর্দশপদীতে পেত্রার্কা, সেক্সপীআর। মধুসূদনের জীবনে চিন্তা ছিল জাতীয় কবিতা, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় মহাকাব্যের। তারই জন্য তিনি ভেবেছেন। আবার মন ছিল বিশ্বমুখী। তাই সমুদ্রযাত্রা করেছেন, ডান্তের জন্মদিবসে কবিতা পাঠিয়েছেন, তৃতীয় নেপোলিআনকে অভিবাদন করেছেন। বঙ্গভারতী ও বিশ্বভারতীর মিলনের অগ্রদূত কবি মধুসূদন।

এই প্রশংগে বাংলাভাষা সম্পর্কে তার বিভিন্ন মত শোনা যেতে পারে। কয়েকটি উৎকলন করছি।

১ আমাদের মাতৃভাষা বড় সুন্দর। শুধু কিছু প্রতিভাবানদের দরকার যারা এ'কে অলংকৃত করবেন। আমরা যারা ছেলেবেলায় ভুল শিক্ষার ফলে বাংলা কিছুই শিখিনি অথচ তাকে ঘৃণা করেছি তারা চরম ভ্রান্ত।

২ আমি এমন কিছু একটা করেছি যাতে আমাদের জাতীয় কবিতা কিছুটা উন্নত হতে পারবে। অন্তত ভবিষ্যতের কবিরা নূতন সুরে গান গাইবে। সে সুর ভারতচন্দ্রের থেকে ভিন্ন। ভারতচন্দ্র নিজে মার্জিতমনা হয়েও এক দূষিতকাব্য ধারার জন্মদাতা।

৩ আমরা এখন শুধু চাই উৎসাহী, পরিশ্রমী, শক্তিমান কর্মী; উদারমনা লোক। তারাই আমাদের বাংলাভাষাকে উন্নত করবে। যদি আমাদের মধ্যে কোন প্রতিভাবান না থাকেন আমরা ভবিষ্যৎ প্রতিভার জন্য পথ তৈরী করে যাই।

৪ স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ঠ সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়—

৫ মূঢ় সে পণ্ডিতগণে আমি নাহি গণি
কহে যে রূপসী তুমি নহ লো সুন্দরী
ভাষা—শতধিক তারে। ভুলে সে কি করে
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপহীনাদুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?
বীণার বসনামূলে জন্ম কি কুধ্বনি?
কবে মন্দগন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতার গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেবযোনি মা তোমার; কাল নাহি নাশে
রূপে তাঁর; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি
নবরসসুধা কোথা বয়সের হাসে?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি
নব শশিকলা তুমি ভারত আকাশে
নবফুল বাকাবনে, নব মধুমতী॥

বহু কবির গীতিমুখরিত বনবীথিকায় মধুসূদন এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যক্ষ আস্বাদন করেছেন জগতের সমস্ত ক্লাসিককাব্যগুলি। এই কারণেই বিশ্বনাগরিক হতে বাধা হয় নি। ঐতিহ্যবোধ তাঁকে বাধ্য করেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথে পথে পরিভ্রমণ করতে। ইউরোপের অর্ঘ্য অঞ্জলিভরে গ্রহণ করতে। তাই নিয়ে রচিত হয়েছে মধুচক্র। সেখানে মিলিত হয়েছে কত দেশের সংগীত, কত কবির কণ্ঠ। সকলের সংগে স্থির হয়ে জেগে আছেন জননী ভারতী—শ্যামা জন্মদে।

শ্যামা কথাটির ৩০ রকম অর্থ পাওয়া গেছে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধানে। তাতে দেখা যায় শস্যশ্যামলাবঙ্গভূমির বিশেষণ রূপে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে মধুসূদনের কাব্যে। রাজনারায়ণ বসু শব্দটি লক্ষ্য করেছিলেন। আর স্মরণ করেছিলেন তিনি যিনি পরে সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা জননীর বন্দনা গেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : কল-প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সু-পবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন। শ্রীমধুসূদন বাংলাসাহিত্যের প্রথম বিশ্বপথিক কবি॥

ঈশ্বরগুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ-মন

অলোক রায়

যদিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী। কিন্তু তার জন্যে বাঙালীর যে বিশেষ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এমন মনে হয় না। অন্ততঃ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দেড়শো বছর কোম্পানীর শাসনকে পিতৃকর্তব্যের এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক শাসনভার গ্রহণকে মাতৃস্নেহের অপার প্রকাশ ভেবে বাঙালী বেশ সন্তুষ্টই ছিল। আসলে বাঙালী তখন নির্জীবতম জাতি—বহু বছরের মুসলমান অধীনতা তাদের মনে বিদেশী রাজশক্তির প্রতি সম্ভ্রমবোধ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে যখন দেশে বিশৃঙ্খলা অত্যাচার এবং অনাচার দেখা দিল, তখন শান্তিপ্রিয় বাঙালী একটি শক্তিশালী শাসকসম্প্রদায়কেই মনে মনে খুঁজছিলো, যারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করে কঠোর হস্তে শান্তি স্থাপন করবে; পেট ভরে খেতে-পরতে পাওয়া আর নিশ্চিন্তে ধর্মের আচার অনুশাসন পালন করতে পারাটাই তাদের ঐহিক মোক্ষলাভের সমান ছিল। সেইজন্যই কোম্পানীর শাসনকে তারা সাদরে বরণ করে নিলো—তেত্রিশ কোটি ঠাকুরদেবতার মধ্যে আর একটি মর্ত্যের দেবতা হিসেবে ইংরেজের পদযুগল মস্তকে ধারণ করে ইংরেজদের প্রতি ভক্তি—গদগদ হোলো। এই ভক্তি প্রধানতঃ এলো, অল্প ইংরেজি শিক্ষিত ইংরেজসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এই শ্রেণীটিকে ইংরেজ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করেছিল—আসলে পুজো পাওয়ার যে আদিম প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে, তাকেই চরিতার্থ করার জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর ইংরেজি শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ। এই শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল একটা কৃত্রিম উপায়ে, ফলে সুস্থ বলিষ্ঠ মানসিক গঠন তাঁদের মধ্যে দেখা দিল না। একটা গোঁজামিল ছিল তাঁদের মধ্যে। দেশকে যে তাঁরা ভালোবাসতেন না এমন নয়, কারণ তাঁরা জন্ম-ধনী ওপরতলার মানুষ নন—কিন্তু ইংরেজ প্রীতি তাঁদের মজ্জায় দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে। এরই কার্যকারণ ফল দেখা দিল, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক অখণ্ডতায় একটি স্পষ্ট চিড় খাওয়ার দাগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজমনের যে স্ববিরোধ দৃষ্ট হয়, এখানেই তার জন্ম।

১৮৫৭ তে যে সিপাই বিদ্রোহ হোলো, তার প্রকৃতরূপ নিয়ে আজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, সেযুগের বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্পদায় সিপাই-বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন না, একটা আপদ মনে করতেন। সাংবাদিক হরিশ মুখোপাধ্যায় (হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয়) থেকে সুরু করে শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু (আত্মজীবনী) পর্যন্ত সকলেই সিপাইদের প্রতি খড়্গহস্ত। আর তাই ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী থেকে যখন এই জাতীয় পংক্তি পাই, তখন অবাক হই না—

১। 'রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানি নে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি
তোমার জয়ের বাসনা।'
(নীলকর)।

২। 'এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেবো না মা, সে ভাবনা।
সেই 'তাতিয়া তোপি'র মাথা কেটে,
আমরা ধরে দেব 'নানা'॥ (দুর্ভিক্ষ)।

৩। 'নানা পাপে পটু 'নানা', নাহি শুনে না না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখো ফাঁদ॥'
(নানা সাহেব)।

'হ্যাদে কি শুনি রাণী?
হ্যাদে কি শুনি রাণী, ঝাঁসীর রাণী,
ঠোঁট কাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?...
এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥
(কানপুরের যুদ্ধে জয়)।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ভারতবাসীর স্বাধীনতা লিপ্সা সমর্থন করতেন না, এর ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়ত শক্ত হবে না, কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল বলেই তো সেই ভীতি এবং নিষ্ক্রিয়তাকে সমর্থন করা যাবে না। অনেকে যদি অন্যায় করেন, তাহলেও অন্যায় অন্যায়ই থাকবে।

তখনই বাঙালীর এই তামসিক মনোবৃত্তির ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে হবে। ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝতে হলে আগে তাঁর যুগকে জানা দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালীরা ইংরেজী ভাষা শেখার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলো। ইংরেজী সাহিত্য সে যুগের বাঙালী তরুণদের টেনে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজি ভাষা অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে আরও বেশি আকর্ষণযোগ্য হয়েছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৮১৫) আগে পর্যন্ত যৎসামান্য ইংরেজি জেনেই কোম্পানীর বিভিন্ন কাজকর্মে চাকরী পাওয়া সহজ ছিল। এবং কোম্পানীর কাছে যে কোনোরকম স্বল্প বেতনে চাকরী পাওয়াকে বাঙালী মোক্ষজ্ঞান করতো। কিন্তু ক্রমে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার বলিষ্ঠতা এবং যুক্তিবাদী মনের প্রকাশ ঘটতে লাগলো। তরুণ সম্প্রদায় চিরকালই একটু বাঁধভাঙা নিয়ম না-মানার দলে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিয়োর ছাত্রেরা আবার এ ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎসাহই পেয়েছিল। যা কিছু ভারতীয় এবং হিন্দুধর্ম চিহ্নিত আচার অনুষ্ঠান,তাকে তারা যে শুধু মানলোনা তাই নয়—লোক দেখানো উচ্ছৃঙ্খলতাও সুরু করলো। ইংরেজদের দেখা দেখি মদ এবং গোমাংস ধরলো, কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখতে পারলো না। প্রকাশ্য স্থানে আহার ব্যাপারে দৌরাত্ম্য করতে লাগলো। টমাস পেইনের লেখা পড়ে তারা সকলেই যুক্তিবাদী এবং মুক্তিবাদী হয়ে উঠলো। সব কিছু সংস্কার থেকে মুক্তি। সব কিছু রীতিনীতি থেকে মুক্তি। কেবল জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানান্বেষণী সভা (১৮৩৮)। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪—?), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র।

ঈশ্বর গুপ্ত এঁদের সমর্থন করতেন না। তাঁর রক্ষণশীল মনই এঁদের কার্যকলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা করতে বাধ্য করাতো। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল' দল তো শুধুই ভাঙার কাজ করে নি—গড়ার কাজেও তাদের প্রচুর দান। কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারে তাঁরা রামমোহনেরই দলে ছিলেন। অথচ দেখতে পাই, ঈশ্বর গুপ্ত এই 'ইয়ং বেঙ্গল'দের একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর পদ্য এবং গদ্য দুইই তীব্র এবং অসংখ্যধারায় প্রবাহিত—

১। 'সোনার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফোঁসফোসনা॥
এরা, না 'হিন্দু' না 'মোছলমান',
ধর্ম ধনের ধার ধারে না।

নয় 'মগ' 'ফিরিঙ্গী', বিষম 'ধিঙ্গী',
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুমির হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।' (দুর্ভিক্ষ)

২। ইয়ং বেঙ্গল। যাঁহারা ইংরেজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, তাহাদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, 'ইয়ং বেঙ্গাল' যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাহার দিগের ভাষার শিক্ষা গুরুমহাশয়ের নিকট 'পরমকল্যাণীয়' পর্যন্ত হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে।' (সংবাদ প্রভাকর, ১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

ঈশ্বর গুপ্ত দেশকে ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই ভালোবাসা, বাঙলা ভাষা এবং বাঙালী আচার-আচরণকে ভালোবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ক্রোধের একটি কারণ মনে হয়, তিনি নিজে ততখানি ইংরেজি জানতেন না। সেযুগে ইংরেজি জানা 'ইয়ং বেঙ্গল'রা নিজেদের সম্বন্ধে এত বেশি অহমিকা প্রকাশ করতেন যে, ইংরেজি না-জানা বাঙালীরা তাঁদের প্রতি ঈর্ষা এবং তজ্জাত রাগ দেখাতেন। অথচ হিন্দুরক্ষণশীল সমাজের নেতা রাধাকান্ত দেব ছিলেন ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য। তাই হিন্দুরক্ষণশীলতা সত্ত্বেও রাধাকান্ত দেব, বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজি শিক্ষা, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল-সোসাইটি পরিচালনা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, হিন্দু যুবককে ডাক্তারী পড়বার জন্য বিলেত পাঠানো, মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ,—ইত্যাদি ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ দ্বারা প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তে এই প্রগতিশীল মনোভাবের যথেষ্ট অভাব দেখি। যদিও সুযোগ পেলেই তিনি সাংবাদিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ধর্মসভার মুখপত্র সমাচার চন্দ্রিকা এবং ধর্মসভাকে গালাগালি দিয়েছেন, তবু তিনি জানতেন, ধর্মসভার সভাপতি রাধাকান্ত দেবের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং উদার মনোভাব সেযুগে বিরল। সংবাদ প্রভাকরের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রতি সংপ্রতি রাজপুরুষেরা যে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তদ্বিষয়ে লিপিবদ্ধ করিতে আমারদিগের অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, স্বয়ং রাজা (গভর্ণমেণ্ট) অবিচার করিলে রক্ষাকর্তা কে আছে; উক্ত মহাশয় সর্ববিষয়ে যেরূপ মহন্মনুষ্য **তাহা পৃথিবীবাসি সমুদয় সুসভ্যস্থানের ভদ্রলোক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, অধুনা বাঙালীর মধ্যে তাঁহার তুল্য ধার্মিক, বিবেচক, মান্য ও সম্বিম্বান ব্যক্তি দ্বিতীয় দৃশ্যমানাভাব, উক্ত মহাত্মা কর্তৃক কোনরূপ নিন্দিত কর্ম সংঘটন হওয়া কখনই সম্ভব নহে,** সুতরাং অন্যায় পূর্বক এমত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানের হানি করাতে ধার্মিকাভিমানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্মলযশে চিরকালের জন্য কলঙ্ককর্দম সংলগ্ন হইল।' (সংবাদ প্রভাকর, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮)।

ঈশ্বর গুপ্ত বোধহয় গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন না। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদলের নেতা রাধাকান্ত দেব তো কুসংস্কার মুক্ত প্রগতিশীল বিভিন্ন কর্মধারা অবলম্বন করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্তের মানসিক প্রতিক্রিয়াশীলতা আরও কতও তীব্র ছিল তার পরিচয় আমরা তাঁর কবিতাতেই পাচ্ছি।

১। মিশনরী সম্প্রদায়ের প্রতি একটী মিথ্যা অনর্থক ভয়ের ফলে তিনি ইংরেজী শিক্ষারই বিরোধিতা করলেন (ডাফ্ সাহেব তাঁর কলেজে কজনকে খ্রীষ্টান করতে পেরেছিলেন তার তালিকা একান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্যদিকে তাঁর কলেজের কত অজস্র বাঙালী হিন্দু-

মুসলমান ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনে তাঁর সাহায্য পেয়েছিল, বাঙলাদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার তালিকা স্মরণাতীত দীর্ঘ)। ঈশ্বর গুপ্তের মত—

'মূর্খ হয়ে ঘরে থাক, ধর্মপথ ধরে। হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল।
কাজ নাই ইস্কুলেতে লেখাপড়া করে॥ আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল॥'

২। স্ত্রী শিক্ষা ও বেথুন সাহেবের বিরোধিতা—

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকটা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিতেন।—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১৪০।)

ক 'আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো, তখন 'এ, বি' শিখে বিবি সেজে,
ব্রতকর্ম কোর্তো সবে। বিলাতী বোল কবেই কবে॥
একা 'বেথুন' এসে, শেষ করেছে, এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে
আর কি তাদের তেমন পাবে। সাজ সোজুতির ব্রত গাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ী মেরে, সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে। পিড়ি পেতে আর কি খাবে।'

খ 'বাঙ্গালির মেয়ে সব হও বটে কালো। দিশি বিদ্যা যাহা শেখ সেই মাত্র ভালো।
পতিব্রতা ধর্মসদা, প্রতিজ্ঞায় পালো॥ অন্ধকারে অন্ধ থাকো, কায নেই আলো।

৩ দেশ প্রেমের এইরকম কবিতা লিখেছেন—

'দেশের দারুণ দুঃখ দেখিয়া বিদরে বুক, লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসি, ছায়ে,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন। শোক অশ্রু করে বরিষণ।

এত চোখের জল কেন? তার কারণ —

'পূর্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর, কোথা পূর্ব রীতিনীতি অধর্মের প্রতি প্রীতি
অনাচারে অবিরত রত। শ্রুতি হয় শ্রুতি পথ হত॥'

৪ এই 'দেশাচার' প্রীতির ফলেই ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সব সময়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, 'বিধবা বিবাহে'র বিরুদ্ধে পদ্যে-গদ্যে সর্বদা আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। (এর সমর্থনে বলা হয়ে থাকে সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্রাহ্মনেতাও বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন না। কিন্তু সেই জন্যেই কি বিধবা বিবাহ দোষের হবে, এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক প্রগতিশীল প্রতিপন্ন হবেন?)—

ক 'বচন রচন করি কত কথা বলে। 'পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে॥ কেহ বলে এযে দেখি সাগরের ঢেউ।'

খ 'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভূ হবে
সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে?' . .

গ 'অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, কূলের ভাবনা আর থাকে না।
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। সে যে অকূল-সাগর, দারুণ ডাগর,
তাতে বিধবাদের 'কূলতরী' কালাপানি বড় লোনা।
অকূলেতে কূল পেল না। যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল'
কূলের তরী থাকলে কূলে তখনি গিয়েছে জানা॥'

ঈশ্বর গুপ্তের এই জাতীয় অজস্র রক্ষণশীল গোঁড়ামীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উক্তিটি সকলেরই জানা — **'কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'** বলা

বাহুল্য বিদেশের ঠাকুর ফেলেও স্বদেশের কুকুর পুজো করার অন্ধ দেশপ্রেম পরবর্তীকালে উগ্র ন্যাশনালিজ্‌মে রূপ নিয়েছে।

দুই

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাতে যদিও কোথাও রামমোহন রায়ের উল্লেখ দেখতে পাইনা, তবুও এজাতীয় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের অনুগত ভক্ত (আর্ডেন্ট সাপোর্টার, ফলোয়ার) ছিলেন। সম্ভবতঃ এই অনুমানের কারণ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্যরচনা যাতে ইতস্ততঃ রামমোহন রায়ের উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে একটি বহুল উদ্ধৃত অংশ মনে করতে পারি—

—দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ংগম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিলনা। "বাবু উমানন্দ ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ড-পীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচুর্য সর্বাংশেই উত্তম হইয়াছিল; তাদৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন।' (সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা ঃ সংবাদ প্রভাকর। ১৩ মার্চ ১৮৫৪)।

রামমোহন যে জলের ন্যায় সহজ গদ্য লিখ্‌তেন, একথা যাঁর রামমোহনের গদ্যের সঙ্গে অল্প মাত্র পরিচয় আছে, তাঁর পক্ষেই বলা অসম্ভব। অন্যদিকে রামমোহনের অনুগত ভক্তের পক্ষে কি করে, রামমোহনের তীব্রতম এবং নিন্দনীয় সমালোচনা, 'পাষণ্ড পীড়ন' গ্রন্থের করা সম্ভব? (বিরোধীপক্ষের লেখা গালাগালিমূলক বই পড়া এবং পড়ে তার শিল্প রীতির চমৎকারিত্ব এবং সরস রচনারীতির কৃতিত্বের কথা ছাপার অক্ষরে জানাবার মত মানসিক উদারতা, যে কোনো যুগেই বিরল)। এখানে 'পাষণ্ড পীড়নে'র যেন তিনি একটু বেশিই প্রশংসা করে ফেলেছেন, এবং তিনি নিজে ঐ গ্রন্থ থেকে 'সরস রচনায় শিক্ষিত' হয়েছিলেন এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। রামমোহনের যিনি ভক্ত হবেন, তাঁর পক্ষে রামমোহনবিরোধী গ্রন্থের উপর তিক্ত মন্তব্য করাই স্বাভাবিক ছিল, এবং বর্তমান মন্তব্য থেকে, ঈশ্বর গুপ্ত যে রামমোহনের অনুগামী ছিলেন এমন তথ্য প্রমাণিত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হওয়ার আগেই রামমোহন এদেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং তার মাত্র দুবছরের মধ্যে রামমোহন বিদেশে পরলোক গমন করেন। রামমোহনের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলনা। সে সময়ে দেশে রামমোহনের যে খুব বেশি প্রভাব ছিল, এমনও মনে হয় না।

এছাড়া, বাহ্যপ্রমাণ ছেড়ে দিলেও, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় রক্ষণশীল যে হিন্দু গোঁড়ামী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির যে পরিচয় কিছু আগে কবিতা উদ্ধৃতি দ্বারা দেখিয়েছি, তা থেকে কি ভারত পথিক নবযুগ-যজ্ঞহোতা সংস্কারক রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছু মাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয়?

ঈশ্বর গুপ্তের কিছু কবিতায় ব্রাহ্মদের মত ভগবানকে পিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সেই পিতৃসম্বোধনের মধ্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'ইয়ার্কি'র ভাবটাই প্রধান। এবং এই ইয়ার্কি ব্রাহ্মোচিত ভক্তির প্রকাশ নয় —

'কাঁহতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা, হাবা আত্মারাম ॥'

তত্ত্ববোধিনী সভার বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ ইত্যাদি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রায়ই প্রকাশ করা হোতো। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। সেযুগে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ ছিল না। তাই দেখি হিন্দুরাও তাতে যোগ দিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অন্যতম উদাহরণ।

রাধাকান্ত দেবের যে সমস্ত কাজ সংস্কার পন্থী শিক্ষিতেরা (প্রধানতঃ 'ইয়ং বেঙ্গল' রা) তাঁর সমালোচনা করতেন, যেমন ধরা যাক্ 'আন্টিলেক্সলোসিস কমিটি' যার জন্যে কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখেছিলেন —

'When the Lex Loci was passed by the Legislature of India, Radhakant Deb not only failed to appreciate the great principle affirmed and recognized by it, but denounced it as an infringement of the rights of the Hindus. Great was his astonishment, greater still his indignation, when on examining the provisions of the law, he found that native Christian converts, always his 'bête novi', were entitled to succeed to their inheritance when their father died intestate; (Radhakant Deb : Kissorychand Mitra—Calcutta Review, August 1867), ঈশ্বর গুপ্ত সেই আন্টিলেক্সলোসিস কমিটির একজন অন্যতম সমর্থক ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' এই নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছিলেন, যার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি —

'হিন্দু ধর্মের বিলোপ ও খ্রীস্টিয়ান ধর্মের উন্নতি দ্বারা ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সম্পূর্ণ অপকার ভিন্ন উপকার কিছু দৃষ্ট হয় না, অতএব এই ভারি বিপদের প্রতিকার প্রয়োজন না হওয়াতে হিন্দুমণ্ডলী একত্রীভূত হইয়া সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হওনের ভয়ে ধনি লোকের পুত্রেরা বিজাতীয় ধর্মাবলম্বন করিতে পারিত না। কিন্তু লেক্সলোসি প্রচলিত হইবায় তাহার পথ এককালে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, অতি সম্ভ্রান্ত হিন্দু শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয় প্রথমেই অগ্রসর হইয়া ধনবান হিন্দুপুত্রদিগকে পথ প্রদর্শন করাইলেন। অথচ এ দেশের লোকের অদ্যাপি চৈতন্য হইল না, প্রত্যুতঃ এরূপ শুনিতে পাই যে হিন্দু গুণেন্দ্র অনেক মহাশয় ইহার সাপক্ষ আছেন, তাঁহারা যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন করেন যে যাহার যে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে তাহার পক্ষে সেই ধর্মাবলম্বী হওয়াই বৈধ। প্রতারণার প্রয়োজন বিরহ। যদি-স্যাৎ, সেই বিশ্বাসে ভ্রম থাকে তবে সে ব্যক্তি এপ্রকার গুরুতর দণ্ডার্হ নহে যে তদ্বারা বিষয়চ্যুত হয়। ইহা সত্য, কিন্তু এস্থলে এক বিষয় বিবেচ্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যৎকালীন এদেশ অধিকার করেন তৎকালে তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিনা যে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্যক্তিই স্ব স্ব জাত্যন্ত ধর্ম ও ব্যবহারানুসারে চলিবেন, রাজা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, যদিস্যাৎ তাঁহারা পূর্ব এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে লেক্সলোসিব দ্বারা অন্যথা হয় কিনা, ফলে যুক্তির সহিত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া সকল বিষয় অনুধাবন করিতে হইলে প্রচলিত ধর্ম ও ব্যবহারের অধিকাংশ লোপ করিতে হয়; ইহা সুবুদ্ধি মহাশয়েরা সুবুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিবেন।' (সংবাদ প্রভাকর, ৩মে ১৮৫২)।

তিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশের সমাজ এবং সাহিত্য মানসে একটি বিরোধ

অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। শশাঙ্ক মোহন সেন এই যুগকে 'ঝড়-তুফানের যুগ' (age of storm and stress) নাম দিয়েছেন। আসলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টিতেই যে গোঁজামিল লুকিয়ে ছিল, পরবর্তীকালে তাদের কাজ-কর্মে, ভাব-ভাবনায় সেই গোঁজামিলই একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপে প্রকাশিত হোলো। ঈশ্বর গুপ্ত এই যুগেরই কবি—এই যুগের প্রথম কবি। তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিষ্ণুদে'র দুটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মনে করি—

১) 'ঈশ্বর গুপ্তকে বলা যায় শেষ জনকবি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অতীতের দিকে বারে বারে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে।'
(সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, পৃঃ ১৩)

২) 'মনে রাখা দরকার যে তিনি যুগসন্ধির, সামাজিক দোটানার, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধের কবি, সে বিরোধে তিনি ঐতিহ্যের চেনাপক্ষই নিয়েছিলেন। দেশজরীতি বা কন্‌ভেন্‌শনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে কন্‌ভেনশনের সামাজিক কাঠামোতে তখন ভাঙন ধরেছে, আর সে রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞান-গরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না।'
(সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, পৃঃ ৩৮)

তার ফলে 'গুপ্ত-কবি তিক্ত দ্বিধায় সাঁমাবদ্ধ'। (ঐ, পৃঃ ৩৭)

ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা কোনোক্রমেই আসামী সাব্যস্ত করে তাঁর ওপর অযথা দোষারোপ করতে চাই না। কিন্তু তাঁর নিরুপায়ত্বের জন্য তাঁর দেশ-কাল-সমাজ দায়ী, সেকথাই বলতে চাই। সে সময়ে সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো স্থিতিস্থাপকতা আসেনি— ঈশ্বর গুপ্ত ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ্যপানে তাঁর কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হওয়ায় 'ব্রাহ্মদের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন।' অথচ কলকাতার রক্ষণশীল ধনী হিন্দু সমাজেও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হবে, আর তাই তাঁদের সঙ্গে বিনীত হাত-কচলানো ব্যবহার। তিনি তাই একাধত সুবিধাবাদীর মত দুকূলই বজায় রেখেছিলেন। তিনি গর্ব করে বলতেন যে একদিন ভিক্ষা করতে বেরোলে এই কলকাতা থেকেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করে আনতে পারেন। তা তিনি পারতেন। কিন্তু কারা সেই ভিক্ষা দিত? যাঁদের সাহায্য এবং সহায়তা নিয়েই কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং পত্রিকাস্থাপন। পত্রিকা স্থাপনে সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষকদের নাম ঈশ্বর গুপ্তকে তাঁর সংবাদ প্রভাকরের একটি সংখ্যায় উল্লেখ করতে দেখি (১লা বৈশাখ ১২৫৩), যাঁদের মধ্যে আছেন হিন্দুসমাজের নেতারা, যেমন রাজা রাধাকান্তদেব, রামকমল সেন, নন্দলাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। এবং সম্ভবতঃ পৃষ্ঠপোষকদের খুশি রাখবার জন্যেই ঈশ্বর গুপ্ত সব সময়ে আধুনিক প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিতে পারেননি। যদিও মূলপ্রশ্ন এখনও বাকী থাকে যে, ঈশ্বর গুপ্ত আদৌ কতটা প্রগতিশীল সত্যিই ছিলেন!

রাজনৈতিক মতের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত কি ধরণের গোঁড়া মহারাণী ভক্ত ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। (উদ্ধৃতিও দিয়েছি)। যুক্ত এবং নির্জীব শান্তির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণতঃ যুক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে নির্বিবাদ নির্জীব শান্তিকেই বরণ করেছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই কবির মধ্যে একটি স্ববিরোধও লক্ষিত হয়। যেমন 'শাঁক-সংগ্রাম' কবিতায় তিনি লিখলেন —

'নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শাঁক।
ধর্মরাজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক ॥

অমর সমরকল্পে, ব্রিটিশের সেনা।
পিপাঁড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা ॥ ইত্যাদি।

কিন্তু সংবাদ প্রভাকরে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, যেমন—'শীক দিগকে 'বিদ্রোহি' শব্দে বাচ্য করা কর্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অস্ত্র ধারণ করে, তাহারদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহারা পুত্তলিকাবৎ রাজা দিলীপ সিংহের রাজ্য রক্ষার্থে যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খল ভঞ্জ করণার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন ও প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে, তাহারদিগের সেনাপতি ও সেনাদিগের মধ্যে কেহই কোনবিষয়ে হীন প্রচার করে না। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাহারদিগের সমাদরের ব্যবহার করেন।' (সংবাদ প্রভাকর, ৬ আপ্রিল ১৮৫১)।

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও ঈশ্বর গুপ্ত কিরকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে কবিতা লিখেছেন তাতো দেখেছি। কিন্তু তিনিই আবার দেখি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেছেন, এবং জাতীয় বক্তৃতা দান করেছেন —

···· 'কতকগুলীন (দেশীয় প্রথা) যাহাতে দেশের অপকার ভিন্ন উপকার নাই, দেশীয় লোকের কুসংস্কার জন্য তা সম্পূর্ণরূপ সংছেদন করা সহজ ব্যাপার নহে, কি আশ্চর্য, আমরা যখন সভ্যতাসভ্যত বিবেচনা করণে সমর্থ হইয়াছি, এবং দোষগুণ সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিতেছি, তখন অবশ্যই অপকৃষ্ট অংশ পরিহার পূর্বক উৎকৃষ্টভাগ গ্রহণ করণে অনুরাগি হইব, পরন্তু যখন কর্তব্যকর্ম সাধারণকল্পে অস্মদাদির অন্তঃকরণ সততই ব্যাকুল হইতেছে, তখন তাহা সম্পন্ন না করিয়া কেন পরমেশ্বরের নিকট অপরাধি হই, এবং এই অতি মহৎ মনুষ্যজন্ম কেন পশুর ন্যায় বৃথা ক্ষয় করি, সে সমস্ত দেশাচার অতি জঘন্য, তাহার প্রতি দ্বেষাচার করাই উচিত হইয়াছে।' (সংবাদ প্রভাকর ৭ মে ১৮৫১)।

এইগুলির মধ্যে থেকে, ঈশ্বর গুপ্ত, তথা সেই যুগের মধ্যে যে স্ববিরোধকে প্রমাণ করতে চাইছি, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এই জাতীয় গবেষণার এখনও সুযোগ আছে যে সংবাদ প্রভাকরের সব সম্পাদকীয় মন্তব্যই ঈশ্বর গুপ্ত লিখতেন কিনা। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে এই জাতীয় বিরোধ প্রায় দেখাই যায় না। পদ্য এবং সম্পাদকীয় গদ্যের মধ্যেই এই বিরোধ প্রত্যক্ষ। তাহলে পদ্য এবং গদ্য কি দুজন লিখতেন? তেমন তো মনে হয় না।

শিল্পকলা ও তার প্রতিরূপায়ণ

মীরা দত্ত

শিল্পকলার সংগে শিল্পের পার্থক্য এই যে শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষ থাকে গৌণ, এমন কী কোন কোন স্থলে অনুপস্থিত, আর শিল্পকলায় মানব মনের ভূমিকাই মুখ্য। শিল্পকলায় শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শুধু আমাদের স্পর্শ করে না, শিল্পীর ধারণা ভাবনা অনুভূতি সব কিছুই আমাদের হৃদয়ে তরংগ তোলে। যা একের তা হয়ে ওঠে বহুর, যা একদেশের তা হয়ে ওঠে সমগ্র পৃথিবীর। তা যদি না হয় তবে শিল্পকলা হিসেবে সে সৃষ্টি মূল্যহীন।

একদা শিল্পের সংগে শিল্পকলার ছিল অঙ্গাংগী সম্বন্ধ। কারণ তখনো মানুষ নিজেই ছিল উৎপাদন পদ্ধতির মূলকেন্দ্র। ক্রমে যন্ত্রের উন্নতির সংগে মানুষ ওর মুখ্য ভূমিকা হতে বিচ্যুত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে তো শিল্প আর শিল্পকলা একার্থ বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই শিল্পকলা ও শিল্প এখন অনেকটা পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুত। এর ফল মানব জাতির পক্ষে ভালো হয়েছে কী মন্দ তা বিতর্কের বিষয়।

তবে শিল্পের তথা যন্ত্রশিল্পের উন্নতি যে শিল্পকলার ওপর একদিক দিয়ে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে সে কথা অনস্বীকার্য। আমি শিল্পকলার প্রতিরূপ ও প্রতিলিপির কথাই বলছি। যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে শিল্পকলার প্রতিরূপায়ণের ক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত ও উন্নত হয়েছে যে শীঘ্রই হয়তো মূলসৃষ্টি ও প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য লোপ পেয়ে যাবে বলে অনেকে আশংকা করছেন। তাঁদের মতে প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতির এই অভূতপূর্ব উন্নতি প্রকৃতপক্ষে শিল্পকলার বিনাশের কারণই হয়ে দাঁড়াবে। এঁদের এই আশংকাকে বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনার সুবিধার্থে আমি বর্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্য শুধু চিত্রকলা ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি দৃশ্যকলার (visual Arts) ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

উপরোক্ত মতবাদের সমর্থনকারীদের মধ্যে লুই মামফোর্ড অন্যতম। তিনি তাঁর "আর্ট অ্যান্ড টেকনিকস্" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির ফলে চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতির প্রতিরূপ প্রস্তুত করা শুধু সহজ ও স্বল্পব্যয় সাধ্য হয় নি, বহুক্ষেত্রেই এমন সকল প্রতিরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে যে শীঘ্রই হয়তো মূল সৃষ্টি ও প্রতিরূপের পার্থক্য লোপ পেয়ে যাবে। এর ফল, মামফোর্ডের মতে, হবে আমাদের শিল্প বোধের তথা শিল্পকলার বিনাশ। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি নিম্নবর্ণিত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়েছেন।

প্রথমতঃ তাঁর মতে প্রতিরূপ সৃষ্টি করা সহজ ও স্বল্প-ব্যয়সাধ্য হয়েছে বলে আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতো চিত্রকলা ইত্যাদির প্রতিরূপও প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে সেগুলি প্রদর্শিতও হচ্ছে সর্বত্র। প্রতিরূপের দৌলতে পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর ও ভাস্করের সৃষ্টি আজ আর সংগ্রহশালায় আবদ্ধ নেই, হাটে ঘাটে মাঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আর অতি পরিচিতির ফলে তারা আর আমাদের অনুভূতিতে তেমন সাড়া জাগায় না—উপরন্তু ক্রমশঃ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। এই প্রসংগে তিনি বলেছেন,—

"It is possible to have too much of a good thing; and indeed, the more

intense, the more valuable an experience is, the more brief its duration. One could perhaps sum this up by saying that a blessing repeated once too often becomes a curse. Novelty, adventure, variety, spontaneity, intensity—these are all essential ingredients in a work of art and a great work of art, like El Greco's 'Tobedo' at the Metropolitan is one that presents this feeling of shock and delight, of new things to be revealed at every encounter with it, such works are in exhaustible in their meaning. But with one proviso; one must not go to them too often. The rarity of experience is an essential preparation for the delight, without rhythm and interval there is only satiation and ennui".

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতেই এ বিষয়ে মামফোর্ডের মতামত স্পষ্ট বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে, প্রতিরূপের সংখ্যাধিক্যের ফলে আমাদের চতুর্দিকে 'ইমেজে'র ছড়াছড়ি। এই সব ইমেজ আমাদের অনুভূতি ও মননকে এমন গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা বাস্তব জগতের সংগে সম্পর্কবিহীন হয়ে পড়েছি। প্রকৃত শিল্পকলা সৃষ্টি করতে হলে চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দেখবার নিজস্ব বিশিষ্ট ভংগী। সে সব কিছুই আমরা ক্রমশঃ হারাতে বসেছি—পূর্ব-সুরীকৃত ইমেজের সংখ্যাধিক্যের দরুণ। ফলে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি ও তার রসাস্বাদনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সংকুচিত হতে চলেছে।

সংক্ষেপে এই হোল মামফোর্ডের অভিমত। এবার সমস্যাটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক্। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে শিল্পকলার ওপর প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতির উন্নতির প্রভাব দুদিক দিয়ে বিচার করে দেখা যেতে পারে,— শিল্পীর দিক দিয়ে ও দর্শক বা শিল্প-ভোক্তার দিক দিয়ে। প্রথমে শিল্পীর কথাই ধরা যাক।

একথা বলাই বাহুল্য যে প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতির উন্নতির ফলে শিল্পীদের খ্যাতি দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেছে। শিল্পসৃষ্টিকে স্থানান্তর করা কঠিন, স্থাপত্যের বেলায় একেবারে অসম্ভব। দূর দূরান্তের দর্শকদের শিল্পীর সৃষ্টির বিষয় অবহিত করতে প্রতিরূপের অবদান অসীম। পৃথিবীর সবার পক্ষে দেশদেশান্তর ভ্রমণ করে সব শিল্প সৃষ্টি দেখে আসা সম্ভব নয়। আর সৃষ্টির অন্ততঃ প্রতিরূপের সংগেও পরিচয় না থাকলে সুধু লোকখ্যাতির ওপরে নির্ভর করে কজন আর শিল্পীর ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারবেন বা তাঁর গুণের প্রকৃত সমাদর করতে পারবেন? আর সুধু তাই নয়, প্রতিরূপের আজ এমন উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে যে মূল সৃষ্টি যদি কোন না কোনদিন বিনষ্ট হয়েও যায় তবু তার প্রতিরূপ দেখে ভবিষ্যতের রসিক সমাজ শিল্পীর ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় হয়তো পাবেন। প্রাচীন, মধ্য ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের যে শিল্পীর কথাই ধরি না কেন, তাঁদের খ্যাতি ছিল সীমিত ভূখণ্ডে আবদ্ধ। ধরুন মাইকেল এঞ্জেলোর কথা। তাঁর খ্যাতি সমসাময়িক কালে ইউরোপের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু পৃথিবীর অপর কোন মহাদেশের লোকেরা তাঁর অমূল্য সৃষ্টির কথা সেকালে জানতো কী? অথচ আজ পৃথিবীর যেখানেই সভ্যতার আলো প্রবেশ করেছে সেখানেই মাইকেল এঞ্জেলোর সৃষ্টির কথা সুবিদিত। আবার মাইকেল এঞ্জেলোর তৎকালীন খ্যাতির সংগে আধুনিক শিল্পী পিকাসোর খ্যাতি তুলনা করলেই বোঝা যাবে এ বিষয়ে প্রতিরূপের অবদান কতখানি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে খ্যাতির এই দেশকাল নির্বিশেষে বিস্তৃতি কী শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য? তার উত্তরে বলবো যে সৃষ্টির পক্ষে নিশ্চয়ই নয়। খ্যাতির মুখ চেয়ে যে সৃষ্টি

তা সৃষ্টি নামেরই যোগ্য নয়। কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রভাব অসীম এবং সে সূত্রে পরোক্ষভাবে তার সৃষ্টির ওপরেও এর প্রভাব পড়ে। খ্যাতি শিল্পীকে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। যে শিল্পীর কোন সৃষ্টিই কারুরই সমাদর পেলোনা তাঁর মর্মবেদনা অনুভব করতে একমাত্র শিল্পীরাই পারবেন। শিল্পসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই তো নিজেকে বিশ্বের সংগে সংযুক্ত করা।

খ্যাতির এই দেশকাল নির্বিশেষে বিস্তৃতির ফলে কোন শিল্পীকে তখন আর কোন একটি বিশেষ স্থানের বা কালের দর্শকদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টির সমাদর স্বদেশে না হলেও বিদেশে হতে পারে, একালে না হলেও দূর ভবিষ্যতে। এই আশ্বাস শিল্পীরা আজ পেয়েছেন বলেই শিল্পের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার বেড়া ভাঙার পালা চলেছে প্রতিনিয়ত। এছাড়া একটা জাগতিক দিকও আছে। বিখ্যাত সৃষ্টির প্রতিরূপের জন্য শিল্পীরা প্রচুর দক্ষিণা পেয়ে থাকেন— সুতরাং আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সহজ হয় তাঁদের পক্ষে। ফলে তাঁদের আর সাধারণের রুচির চাহিদা না মেটালেও চলে। বস্তুতঃ শিল্পীর পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতার মূল্য অসীম, বিশেষ করে সে স্বাধীনতা যদি কোন সৃষ্টির মান ক্ষুণ্ণ না করে পাওয়া যায়।

এর পরে আসে মামফোর্ডের দ্বিতীয় আপত্তির কথা। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে তাঁর মত অভ্রান্ত নয়। আমাদের চতুর্দিকে আজ 'ইমেজে'র ছড়াছড়ি তা সত্যি এবং তা আমাদের অনুভূতি ও মননকে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করে রাখে এটাও সত্যি। কিন্তু যারা সত্যিকারের শিল্পী তাঁদের দৃষ্টি বাস্তবের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। পূর্বসুরীকৃত 'ইমেজে'র অরণ্যে হারিয়ে যান যেসব শিল্পী তাঁরা নিশ্চয়ই প্রকৃত শিল্পী নন। আর প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্বল্পতার কথা যে মামফোর্ড বলেছেন তার কারণ বর্তমান জগতের যন্ত্র নির্ভরতা,—যা মানুষের ভূমিকাকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের কোঠায় এনে ফেলেছে। তাই হয়তো আমরা আজ নিজে খেলার চেয়ে খেলা দেখতে বেশী ভালোবাসি। যতদিন আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সজীব ভূমিকা না নিতে পারবো — ততদিন অনুভূতির সেই আদিম তীব্রতা অনুভব করা আমাদের— (শিল্পীরও) সম্ভব হবেনা। এরজন্য শিল্পকলার বহুল প্রতিরূপায়ণকে দায়ী করা উচিত হবেনা।

তদুপরি নবীন শিল্পীদের পক্ষে পূর্বসুরীদের সৃষ্টির প্রতিরূপ খুবই কাজে লাগে— শিল্পসৃষ্টির আঙ্গিক ও ব্যাকরণ শেখার কাজে; সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করার কাজে। হয়তো অনেকে বলবেন যে এসব জিনিষ মহৎ শিল্পীরা নিজ নিজ প্রতিভা বলে আবিষ্কার করে নিতে পারেন— পূর্বসুরীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। হয়তো হয়না— কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিভার বিরাট অপচয় ঘটে। প্রতিটি শিল্পীকে যদি আঙ্গিক ও ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিজে আবিষ্কার করে নিতে হোত তবে কী সময় ও শক্তির প্রচুর অপচয় হোত না? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি আইনষ্টাইনকে নিউটনের সূত্র হতে আরম্ভ করে পদার্থ বিদ্যার প্রতিটি খুঁটিনাটি আবিষ্কার করে নিতে হোত তবে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারের জন্য কতটুকু সময় ও শক্তি অবশিষ্ট থাকতো? কলা বিদ্যার ক্ষেত্রেও তাই। পূর্ব সুরীদের কাছে প্রতিটি শিল্পীকেই যেতে হয়। অথচ সবার পক্ষে সর্বত্র যাওয়া সম্ভব হয়না— মূল সৃষ্টি দেখাও সম্ভব হয় না। তখন মূল সৃষ্টির প্রতিরূপই তো তাদের ভরসা!

এছাড়াও এবিষয়ে আরো অনেক কিছু বলা যায়। বর্তমানে প্রতিরূপায়ণের পদ্ধতি (লিথো গ্রাফী, কালার ফোটোগ্রাফী, কালার প্রিন্টিং প্রভৃতি) এমনই জটিল হয়েছে যে প্রতিরূপায়কের যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পবোধ ও বর্ণজ্ঞান না থাকলে প্রতিরূপায়ণ সফল হতে পারে না। যুগান্তকারী সৃষ্টি করার প্রতিভা যাঁদের নেই, অথচ শিল্পবোধ ও পরিমিত ক্ষমতা আছে এমন শিল্পীদের পক্ষে প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতিতে নিজ ক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার অবকাশ আছে।

অর্থাৎ দেখা গেল যে শিল্পীর দিক দিয়ে কলাশিল্পের প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতির উন্নতির ফলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু লাভের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। এবার আসা যাক দর্শকের ভূমিকায়।

প্রতিরূপায়ণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজ শিল্পকলা শুধু মুষ্টিমেয়র দরবারে নিবদ্ধ নেই সাধারণের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবিদের পক্ষে সম্ভব নয় কোনও ছবি বা মূর্তি কেনা, সম্ভব নয় দেশ দেশান্তর ঘুরে দেখা অজন্তা, রোম বা প্যারিসের চিত্রশালা, বোরোবুদুর, তাজমহল বা কলোসিয়াম। এদের কলাপিপাসা গত যুগে সেটা সম্ভব ছিলনা, আজ হয়েছে। অনেকে হয়তো বলবেন যে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটেনা,— হয়তো মেটেনা, তবু পিপাসা কিছু তো ঘোচে। আজ ইচ্ছে যার আছে তার জন্য রয়েছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত সৃষ্টির প্রতিরূপ — লাইব্রেরীতে, মিউজিয়ামে। মামফোর্ড হয়তো বলবেন যে শিল্পকলা মূলতঃ সর্বসাধারণের জিনিষ নয়। তা শুধু শিল্প বোধ বিশিষ্ট জনকয়েক রসিকেরই জন্য। হয়তো তাঁর মতে শিল্পকলা আজ সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই তার অবনতি ঘটেছে —দশের মধ্যে মিশে গিয়ে তা হয়ে উঠেছে সস্তা রুচির বাহন। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয় স্বীকার করি। একথা সত্যি যে প্রত্যেকেরই শিল্পবোধ থাকেনা এবং সেধরণের লোকের কাছে শিল্পকলার অবমাননা ও অপব্যবহার হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু এটাওতো অনস্বীকার্য যে জ্ঞানার্জনের মতো কলাপিপাসাও মানবমনের শাশ্বত পিপাসা এবং তা মেটাবার অধিকার প্রতেকেরই থাকা উচিত। আজও তো আমরা এমন লোকের সংস্পর্শে আছি শিক্ষার অপব্যবহারটুকুই যাঁরা শিখেছেন? কিন্তু সেই যুক্তিতে কী আমরা গণশিক্ষার বিরোধীতা করি? কাজেই অপব্যবহারের আশংকা যতোই থাক; কলাপিপাসা মেটাবার অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার বলেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, বিশেষ করে এই গণতন্ত্রের যুগে। প্রতিরূপায়ণ পদ্ধতির উন্নতি সাধারণের এই পিপাসা মেটাতে সাহায্য করছে এটাতো আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ।

তাছাড়া শিল্পকলার মূল সূত্রই তো হচ্ছে শিল্পীর নিজের ভাবনাকে অপরের প্রাণে সঞ্চারিত করে দেওয়া। আর তাহলে সেই আবেদনের ক্ষেত্রটি মুষ্টিমেয়র মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করাই কী উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়?

আমার জনৈক বন্ধু একদা তর্ক তুলেছিলেন যে তাই যদি হয় তবে প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা কেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, দুর্গম স্থানে সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কী উদ্দেশ্য ছিলনা যে সেখানে যেন যথার্থ রসিকেরই শুধু সমাগম হয়—সাধারণের নয়?

এপ্রশ্নের সঠিক উত্তর অবশ্য আমি দিতে পারিনি। কারণ সেকালের শিল্পীরা কী মনোভাব নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অজন্তা ইলোরার সৃষ্টি করেছিলেন তা আজ জানা সম্ভব নয়। তবে এর উত্তরে বলা যায় যে শিল্পকলাকে সাধারণের দরবারেই দাঁড় করিয়েছেন এমন প্রাচীন শিল্পীরও উদাহরণ আছে। একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রাচীন ভারতে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই কলাশিল্পের বিকাশ চরমে উঠেছিল। আর এই সব মন্দির তো শুধু মুষ্টিমেয়র জন্য ছিলনা, ছিল সবার জন্য। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের সব কিছু আদর্শ কী আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি? তাঁরা কোথাও কোন স্বাক্ষর রেখে যাননি— সর্বত্র নিজেকে উহ্য রেখেছেন। এটা প্রশংসনীয় মনোভাব সন্দেহ নেই— কিন্তু এযুগের শিল্পীরা কী তা গ্রহণ করতে পারবেন? কাজেই শুধুমাত্র প্রাচীনযুগের উদাহরণে শিল্পকলাকে মুষ্টিমেয়র দরবারে আবদ্ধ রাখা কী উচিত হবে?

এরপর আসা যাক্ শিল্পসৃষ্টির বহুল প্রতিরূপায়নের বিরুদ্ধে মামফোর্ডের প্রধান আপত্তির কথায়। অতিপরিচিতি আমাদের অনুভূতিকে অসাড় করে তুলতে পারে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিরূপের প্রতিই আমাদের অনুভূতি অসাড় হয়—মূল সৃষ্টির প্রতি নয়। সত্যিকারের মহৎ সৃষ্টির এমন একটা আবেদন আছে যা নিতান্ত অরসিকের মনকেও স্পর্শ না করে পারেনা। সেই আবেদন প্রতিরূপে কী সবটুকু পাওয়া যায়? বিখ্যাত ভেনাসের প্রতিমূর্তি তো আমরা অনেক দেখেছি— বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গতানুগতিক প্রতিমূর্তির পাশে কোলকাতার অনেক দোকানেই তা কিনতে পাওয়া যাবে। ঐ ভেনাসের মূর্তি আমাদের মনকে খুব একটা আন্দোলিত করবেনা ঠিকই। কিন্তু আজ যদি লুভ্‌র্‌এর ভেনাসের মূর্তির সম্মুখীন হই তবুও কী আমরা অভিভূত হবো না? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে প্রতিরূপের মারফৎ আমরা যতই পরিচিত হইনা কেন, মূল সৃষ্টির আবেদন এতো বিপুল যে তার পাশে অনুভূতির অসাড় হয়ে থাকার ক্ষমতা নেই—যদিনা মন সম্পূর্ণ শিল্পরসবোধ শূন্য হয়। আরো একটা উদাহরণ দিই। এদেশে তাজমহলের ছবি যেমন যত্রতত্র প্রকাশিত হয় তেমন বোধ হয় খুব কম স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের ভাগ্যেই ঘটে।

শৈশবে ইতিহাসের পাতায় পরিচয় হয় তাজের প্রতিরূপের সংগে,—বয়সের সংগে সংগে সে প্রতিরূপ আমাদের অসংখ্যবার দেখা হয়ে যায়। এমনকী সত্যিকারের তাজমহল দেখতে রওনা হলেও রেলষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে তাজমহলের প্রতিকৃতি না দেখে উপায় নেই। কিন্তু এতো পরিচিতির পরও আমরা যখন অস্তমিত সূর্যের আলোয় রাঙা অথবা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত তাজমহলকে দেখি তখন কী মনে হয়না যে এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই, মনে হয়না কী পার্থিব কোলাহলের মাঝে এ একছত্র কবিতা? ছেলেবেলা হতে দেখে আসা প্রতিকৃতি কী আমাদের প্রকৃত তাজমহলের রসবোধে বাধা ঘটায়? আমার তো মনে হয় না। উপরন্তু সকল প্রতিরূপ মূল সৃষ্টির সংগে আমাদের একটা প্রারম্ভিক পরিচয় গড়ে তোলে। যে পরিচয়টুকু সারা না হলে শিল্পের অন্দর মহলে পৌঁছানো যায় না। যাকে জানা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল তার মাঝে অজানা বিস্ময় ও সুষমা আবিষ্কার করে আমরা চমৎকৃত হই। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বাণীটুকু অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি। তদুপরি প্রতিরূপের মারফৎ প্রাথমিক পরিচয় ঘটলে তবেই আমাদের পক্ষে মূল সৃষ্টির গঠন বৈচিত্র্য, আঙ্গিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকর্ম এসব লক্ষ্য করা ও বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। নয়তো প্রথম দর্শনে কোন সৃষ্টির সামগ্রিক আবেদনই মনকে বিমুগ্ধ করে বেশী বিশ্লেষণের অবকাশ পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ যেদিক দিয়েই দেখিনা কেন, মামফোর্ডের আশংকাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারিনে। তবে একটি কথা। উপরোক্ত বক্তব্যগুলি সবই সফল প্রতিরূপ ও তার যথাযথ ব্যবহারের প্রতি আরোপ্য। বিকৃত প্রতিরূপ ও তার অপব্যবহারের প্রতি নয়। মহৎ সৃষ্টির প্রতিকৃতির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে বৈকী। আমাদের বর্তমান জীবনে এই অপব্যবহারের উদাহরণ বহু পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পকলার বহুল প্রতিরূপায়ণ তার কারণ নয়। কারণ হচ্ছে আমরা শিল্পকলাকে আমাদের বর্তমান জীবনের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে নিতে পারিনি। উপযুক্ত শিল্পবোধ আমাদের জন্মায়নি আজো। যতদিন আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে শিল্পকলার ভূমিকা মুখ্য ও নির্দিষ্ট না হচ্ছে, ততদিন শিল্পকলার অবমাননাকারী কিছু সংখ্যক লোক থাকবেই। তবে সুখের বিষয় এই যে জগতে এঁরা ততোটা সংখ্যাগুরু নন। তাই আধুনিক জগতে শিল্পকলার পরিণাম ভেবে আজো হতাশ হবার কারণ নেই।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

জিউসেপি

প্রফেসার জিওভানেল্লির আতলিয়েতে নিয়মিত খোসগল্প করতে আগত পড়শীদের মধ্যে বৃদ্ধ জিউসেপির উপস্থিতি ছিল প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকাল কি দুপুর বা অপরাহ্ণে কিছু একটা জানবার কি বলবার অজুহাতে তিনি পাঁচ মিনিট বসব বলে সারা বেলাটা ঐখানেই কাটিয়ে দিতেন। অন্য কেউ হলে এই বসে বিনা কাজে বকবকানির জন্য জিওভানেল্লির কাছে তাড়া খেয়ে আপন পথ দেখত। বৃদ্ধ জিউসেপির কিন্তু ছিল সাতখুন মাপ। মাঝে মাঝে যদিও তাঁর বিরাম-বিহীন এক ঘেঁয়ে বাকাধারায় আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ধ্বসে যাবার মত হোত প্রফেসার তাঁর বিরক্তির আভাস পর্য্যন্ত মুখে প্রকাশ করতেন না পাছে বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে মনে আঘাত পায়।

জিউসেপি আতলিয়েতে সকালে এলে প্রফেসারকে 'ব'জুর জোন্ ওম' ও আমায় 'ব'জুর মনাফা' বলে ভদ্রসম্ভাষণ জানাতেন। যে কোন কারণে জিওভানেল্লি তাঁর কাছে যুবক প্রতিপন্ন হলেও আমি কি কারণে শিশুর পর্য্যায়ে পড়লাম তা বুঝতে না পারায় একদিন তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলাম। আমি জানতাম না যে এই বৃদ্ধের অবর্তমানে লোকে তাঁর সম্বন্ধে যে আলোচনা করুক সামনা সামনি তাঁকে প্রশ্ন করবার মত সাহস অনেকেরই ছিল না। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তিনি বেশ আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থেকে পরে বেশ রুক্ষস্বরে বললেন "তোমার বয়েস কত হবে ছোকরা!" বল্লাম তেইশ বছর পার হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছি এবং সেটাকি শিশুর বয়েস? "তিনি বল্লেন, তোমার প্রফেসারের বয়েস হচ্ছে ছাপ্পান্ন আর আমি চুরাশিটা শীত কাটিয়ে দিয়েছি কাজেই হিসাব করে নাও তোমার শিক্ষককে যুবক ও তোমাকে শিশু বলার অধিকার আমার আছে কিনা। বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। প্রায় সাড়ে ছফুট দীর্ঘ ও মেদবাহুল্যবিহীন তাঁর দেহ যষ্টীতে দাঁড়ান অবস্থায় মাথা থেকে পায়ের গোড়ালির উপর প্লাম লাইন ফেলে বার্দ্ধক্যের বক্রতার আভাস পর্য্যন্ত দেখা যেত না। ইস্পাতের মত দৃঢ় তাঁর মাংসপেশীগুলি যেন সর্বদা দমে পাক দেওয়া স্প্রীংএর মত সক্রিয় দেখাত। চুরাশী শীতের ছাপ ছিল কেবল তাঁর চুপ্‌সে পড়া মুখে শত সহস্র কুঞ্চন ও রেখায়। জিউসেপি হাসলে সেগুলি আরো উচুনীচু হয়ে লাগলচষা খেতের মত দেখাত। রুদিদর পাড়ায় প্রায় সব প্রস্তর শিল্পীদের আদিবাস ছিল ইতালির মর্ম্মর-প্রস্তর প্রধান কররারার সহরে বা পল্লীতে। তাদের মধ্যে সক্ষম অবস্থায় জিউসেপি ছিলেন সেরা কারিগর। পঞ্চাশ বছর আগে পারীতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাজে মন প্রাণ ঢেলে তিনি ভুলতে চেষ্টা করতেন বিয়োগের এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ শোককে। জিউসেপি ও তাঁর স্ত্রীর প্রণয় শুরু হয়েছিল কৈশোর থেকে এবং পত্নীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁদের এই প্রেমের জোয়ারে কোনদিন একটুকুও ভাটা পড়েনি। বিপত্নীক বৃদ্ধ এখনও জাগিয়ে রেখেছেন সেই প্রেমের স্মৃতিকে সমানভাবে। জিওভানেল্লির কাছে শুনলাম যে জিউসেপির ঘরে এখনও তাঁর স্ত্রীর সাজ পোষাক, আসবাব পত্র পরিপাটিভাবে সাজান আছে। তাঁর বন্ধু বান্ধবরা বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি পুনর্বিবাহ করেন। জিউসেপির বাইরেটা রুক্ষ বিরস দেখালেও তাঁর অন্তরটা ছিল দয়া মায়া আর স্নেহের

রসে কানায় কানায় পূর্ণ। তাঁর দীর্ঘ-সবল ও সক্ষম শরীরে বাহ্যত কোন ভাঙনের চিহ্ন না দেখা গেলেও ভিতরটা সেইমত সুস্থ ছিল না। দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত পাথরের মিহিগুঁড়ো নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসে বালি ফেলতে ফেলতে সেটাকে জমাট করে প্রায় নিরেট করে দিয়েছে। তাই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে এখন পাথর কাটা ছাড়তে হয়েছে। চিকিৎসকদের ভ্রমই তাঁর স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর কারণ এই ধারণা হওয়ায় ফরাসী ডাক্তারদের প্রতি জিউসেপির প্রচন্ড বিদ্বেষ ছিল। তাই প্রথমে তাদের দেওয়া কাজ বন্ধ করার নির্দেশকে তিনি গ্রাহ্য না করলেও পরে স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট ও মুখে রক্ত ওঠায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পাথর কাটা থেকে অবসর নিতে হয়েছে। তাঁর এই অক্ষমতাকে ভুলবার চেষ্টায় বোধহয় তিনি এত ঘন ঘন আসতেন জিওভানেল্লির কর্ম্মশালায়।

এই সময়ে নিউইয়র্ক থেকে কোন এক অর্থপ্রতিষ্ঠালব্ধ শিল্পী প্রফেসার জিওভানেল্লিকে প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাষ্টারের ছোট মূর্ত্তিকে পাথরে ছগুণ বড় করে নকল করার বায়না দিয়েছিল। মূর্ত্তিটি ছিল তারায়-ভরা কাপড়ের উপর শয়ান একটি নগ্না নারী এবং এর নাম লেখা ছিল "রজনী" বলে। মূর্ত্তিটি পাথরে শেষ হলে নিউইয়র্কের কোন পার্কে শায়িতা থেকে দর্শকদের দৃষ্টি ও মনকে রঞ্জন করবেন এই ব্যবস্থা ঠিক ছিল। জিওভানেল্লিও তাঁর এক সহকর্মী তিনসেট ক্যালিপারস নিয়ে এক বিরাট বোর্ডের উপর মূর্ত্তিটির মাপের ছগুণ বড় ঘনত্বের পরিমাপকারি এক ত্রিভুজ এঁকে তার সাহায্যে মাপ জোপ করে পাথর খন্ডের উপর আক্রমণ শুরু করে দিলেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক মূর্ত্তির ঘন পরিমাপে ঠিক বহুগুণ বড় বা ছোট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার পন্থা কবে থেকে ইতালিতে প্রচলিত হয়েছিল বলা শক্ত। দোনাতেল্লো, ঘিবার্রাতি, ও মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ ভাস্কর রথীরা এইভাবেই পাথর কেটে তাঁদের বিরাট মূর্ত্তির পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রসরে আজ বহুবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন অতীতে মানুষের বহু পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলিকে সহজ করে তার কর্ম্মক্ষমতার পরিসরকে বিরাট করে তুলেছে। কিন্তু চিত্রণ ও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে আজও রয়ে গেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত সেই তুলি, রঙ, ছেনী আর হাতুড়ি এবং তাদের সেই একই প্রয়োগ প্রণালী।

মূর্ত্তিটি পাথরে বড় করে নকল করবার সময় জিওভানেল্লি তার গঠনে বহুবিধ ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে তার নবরূপ দিলেন। তার এই উন্নততর নবরূপান্তর দেখে প্রফেসারকে জিজ্ঞাসা করলাম "পাথরে মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ হলে এর স্রষ্টা হিসাবে কার নাম লিখে দেওয়া উচিত?" তিনি বল্লেন "জান হে এই শিল্পীর নামটা পর্য্যন্ত আমাকে পাথরে কেটে লিখে দিতে হবে কারণ তিনি জীবনে কোনদিন ছেনীতে হাত দেননি।"

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু পার্কে স্মৃতিসৌধে ও শিল্পসংগ্রহশালায় বহু পাথরের মূর্ত্তি নকল ভাস্করের নাম ও যশকে ঘোষণা করছে কিন্তু সেগুলির আসল স্রষ্টারা রুদিদর গরীব ভাস্করদের মত অজ্ঞাত ও অখ্যাত রয়ে গেছে। যেমন সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খেয়ালি ধনীদের কেউ কেউ কুশলী দরিদ্র লেখক ও সুরকারের সাহিত্য ও সুরসৃষ্টিকে অর্থের বিনিময়ে নিয়ে আপন রচনা বলে নাম জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন এবং করে থাকেন, শিল্পের ক্ষেত্রেও চলে এই নীচ প্রতারণা। রুদিদয় তখন বিদ্যার শিক্ষানবিশি করবার সময় ভাবতে পারিনি যে একদিন অভাবের তাড়নায় আমায়ও নিজের কয়েকটি রচনাকে অপরের নাম এবং খ্যাতির খাতায় সঁপে দিতে হবে।

প্রফেসার জিওভানেল্লি মূর্ত্তিটি কাটতে কাটতে একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খানিকটা বাড়তি পাথর থাকায় তার চারপাশে ছোট ছোট গর্ত্ত কেটে তার মধ্যে সূচাগ্র ছোট সাইজের ছেনী কতকগুলি বসিয়ে ক্রমান্বয়ে হাতুড়ির ঘা দিতে দিতে সেটাকে পরিষ্কার সমান লাইনে খসিয়ে ফেল্লেন। সেই সুন্দর দাঁনাবাঁধা কারারা খনির পাথর খণ্ডকে পাশের গাদায় আবর্জ্জনা হিসাবে ফেলে দিতে মন চাইল না। কিন্তু তার পাশের পরিসর এমন ছিলনা যাতে পুরোপুরি নিজে একটা কোন মূর্ত্তি কাটা যেত। এই আতলিয়ের দেওয়ালের চারদিকে লটকান ছিল মানুষের হাত, পা, মুখ ও শরীর নানা ভঙ্গিতে ছাঁচে তোলা প্লাষ্টার কাস্‌ট্‌। এ ছাড়া বহু বিখ্যাত ভাস্করের গড়া মূর্ত্তির প্লাষ্টারের প্রতিরূপের কিছু কিছু টুকরোও এখানে ওখানে লাগান ছিল। আমার সামনে ছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর 'কারপো'র করা পারীর অপেরা গৃহ অলঙ্কৃত লা দাঁস-এর উদ্দাম নৃত্যকারী মূর্ত্তিগুলির একটির হাসিভরা মুখ। আমি সেই বরাদ্দ বাতিলকরা পাথরের টুকরোটা কেটে রূপ দেবার আয়োজন করে ফেল্লাম। জিওভানেল্লি আমার তোড়জোড় দেখে কাজ থামিয়ে কিছু একটা মন্তব্য করবার উদ্যোগী হয়ে শেষে কিছু না বলে কেবল ইঙ্গিতপূর্ণ একটা মাথার দোলানি দিলেন অর্থাৎ তাঁর কাছে আমার এই প্রচেষ্টা যেন একটা নিছক পাগলামি। এই সময়ে বৃদ্ধ জিউসেপি এসে আমার মার্বল কাটার ব্যবস্থা দেখে বল্লেন "ভিত্তর (জিওভানেল্লি) তোমার এই দিয়াবল্‌ ছাত্রটি দেখছি কারপোর নর্ত্তকীর মুখের হাসি কেড়ে নেবার মতলবে আছে।" তারপর আমাকে শাসিয়ে বল্লেন "এটাকে কিন্তু এক সপ্তাহে শেষ করতে হবে এবং তা যদি না কর তা হলে আমি এটাকে ভেঙে ফেলে দেব আর সেই সঙ্গে তোমার মাথায়ও দু'ঘা বসিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারব না। আমার যারা ছাত্র ছিল তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। ভিত্তর নিজে কাজ করে ভাল কিন্তু কি করে ছাত্র তৈরী করতে হয় তা জানে না।" মনে মনে বল্লাম "আমার বহু সৌভাগ্য যে আপনার ছাত্র হওয়ার যোগাযোগ ঘটে নি।"

ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় আমার প্রতি কিছুটা প্রসন্ন ছিলেন কারণ দিন ছয়েকের মধ্যে মুখটি পাথরে নকল করা শেষ হয়ে গেল। জিওভানেল্লির প্রশংসার প্রত্যাশী হয়ে যখন পরদিন আত-লিয়েতে ঢুকছি বঁজুর-এর প্রত্যাভিবাদন স্বরূপে পেলাম এক প্রচণ্ড ধমক। প্রাচীন শৈলী-পন্থী ইতালিয় ভাস্কররা মূর্ত্তির দন্তবিস্ফারিত হাসিমুখে প্রত্যেকটি দাঁত আলাদা করে কাটেন না, কেবল দন্তপঙক্তির স্থান সমান নিরেট কেটে দেন। আমি এ রীতি জানতাম না এবং আরো আমার জানা ছিল না যে জিওভানেল্লি ছিলেন উৎকট রকমের প্রাচীনপন্থী। কাজেই এই মুখ-টিতে প্রত্যেকটি দাঁতের আকৃতিকে সুস্পষ্ট করে দেখানর ফলে সকালেই তাঁর এই আকস্মিক ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধির প্রকোপ। এই অশুভক্ষণে জিউসেপির আবির্ভাবে ভাবলাম এতক্ষণ হিটলার-এর হুমকি হচ্ছিল এইবার হিমলার এর হামলা হবে অতএব তার আগে চম্পটের ব্যবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু সুযোগ করে নেওয়ার আগেই তাঁর লম্বা পেশী বহুল হাত আমার কাঁধ বজ্র মুষ্টিতে ধরে এক নাড়া দিতেই বুঝলাম পরিত্রাণের চেষ্টা করা বৃথা। তিনি অধ্যাপককে বল্লেন, "কি ব্যাপার, অত চোখমুখ লাল করে চেঁচাচ্ছো কেন বাড়ীতে কি আজ সকালে ঝগড়া করে বেরিয়েছ ?" তাঁর রাগের কারণ শুনে বৃদ্ধ বল্লেন "মূর্ত্তির দাঁত দেখিয়েছে তো কি এমন গস্‌পেল্‌ অশুদ্ধ হল। ওকে আগে জানাওনি কেন ওর কি করা উচিত ছিল। মাইকেল এঞ্জে-লোর পথ না ধরে ও যদি বার্নিণির পথে চলতে চায় তা তো তোমার রুচির গণ্ডি দিয়ে তুমি রুখতে পারবে না। কিন্তু সে হবে পরের কথা এখন অন্তত ভালভাবে পাথর কাটতে তো শিখুক।" আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি আজ জিউসেপির এই মধুর রূপান্তরের কারণ কি। কিন্তু এই

অবাককান্ড ঐতেই শেষ হল না। তিনি বল্লেন "তুমি আমার কথা রেখেছ এর জন্য তোমার বড় ইনাম পাওয়া উচিত। অপেক্ষা কর আমি এখুনি আমার বাড়ী হয়ে আসছি।" অপসৃয়মান বৃদ্ধের অভিমুখে জিওভানেল্লিও কিছুটা হতবাক হয়ে দেখে বল্লেন "জিউসেপি তোমার জন্যে কি ইনাম আনছে জানিনা তবে তোমার সবচেয়ে বড় পুরষ্কার তার প্রশংসা ও স্নেহ অর্জ্জন। এই বৃদ্ধকে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাউকে নরম করে সম্বোধন পর্যন্ত করতে শুনিনি।"

কিছুক্ষণ পরে কাঠের একটি হাত বাক্স নিয়ে জিউসেপি ফিরে এলেন এবং সেটিকে আমায় দিয়ে বল্লেন "এই নাও তোমায় ইনাম। এই বাক্সর মধ্যে পাবে আমার সারা জীবনের কর্ম্মের সহচরগুলি। ভাস্কর্য্যের প্রতি এবং আমার প্রতি যদি তোমার কিছু শ্রদ্ধা থাকে তা হলে তারই স্মরণে এগুলিকে অবহেলা করো না, এদের উজ্জ্বল, মসৃণ ও সক্রিয় রেখ এই আমার অনুরোধ।" বাক্সটি খুলে দেখলাম বিভিন্ন আকারের ফলাযুক্ত নানান রকমের বহু ছেনী এবং পাথর কাটার দুটি ভারী হাতুড়ি। বল্লাম "এগুলি নিশ্চয়ই আপনার আপন কাজের যন্ত্রপাতি, আমাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে দিচ্ছেন কেন!" তাঁর অলক্ষে জিওভানেল্লি ঘন ঘন অঙ্গভঙ্গি করে ইঙ্গিত করছিলেন যাতে আর বাক্যব্যয় না করে বাক্সটি নিয়ে ফেলি। আমি মূর্খের মত প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম তিনি যেন এই ছেনীগুলি ও হাতুড়ির দামের অন্তত কিছুটা আমাকে দিতে দেন। প্রফেসার ততক্ষণে ধৈর্য্য হারিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন— "আর কতক্ষণ ভনিতা করে ক্লান্ত জিউসেপিকে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তোমার মাথায় কি এখনও চেতনা হয়নি যে এই অমূল্য উপহার খুব অল্পলোকের জীবনে মিলে থাকে।" বাক্সটি নিয়ে বল্লাম "সিনর জিউ-সেপি আপনার এই মহান দানে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত তাকে ভাষায় কেবল ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ব্যক্ত করার বৃথা প্রয়াস করবো না। আপনার আশীর্বাদে একদিন যেন এই সম্মানের যোগ্য অধিকারী হতে পারি।" এই বাক্সে কেবল জিউসেপির নিজের ব্যবহৃত ছেনী ছিলনা তার পিতা ও পিতামহেরও ব্যবহার করা জিনিষও ছিল।। বংশ পরম্পরায় এই পরিবার কত শতাব্দি ধরে ধারাবাহিক ভাবে পাথরে মূর্ত্তি গড়ে এসেছে। আজ নিঃসন্তান জিউসেপির জীবনে সেই ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম যে এই দানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কতখানি পুঞ্জিভূত আপশোষ।

তিনি চলে গেলে প্রফেসার বল্লেন "তুমি যদি ইচ্ছে কর তা হলে জিউসেপির চিকিৎসার খরচের জন্য কিছু অর্থ আমার হাতে দিও কারণ ওর তো আর কোন সম্পত্তি নেই। আমরাই চাঁদা করে মাঝে মাঝে ওর চিকিৎসার খরচের ব্যবস্থা করি তাও ওকে না জানিয়ে পাছে ওর মনে আঘাত না লাগে এই ভেবে যে আমরা ওকে দয়া দেখাচ্ছি।"

দু' একদিন পরে জিউসেপি এসে বল্লেন "জান হে আজকাল পৃথিবীতে বেশ কিছু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। কাল এক ফরাসী ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল। তাকে যখন বল্লাম 'আমি তোমায় ডাকিনি এবং তোমায় ফি দেবার মত আমার সামর্থ নেই আর থাকলেও দিতাম না কারণ ফরাসী ডাক্তারদের অজ্ঞতার ফলে আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে আবার তোমাদের আমার প্রতি সেই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে দেবার কোন ইচ্ছে নেই। সে উত্তর দিল যে আমার অসুস্থতার সংবাদ লোকের কাছে শুনে নিজে থেকেই সে এসেছে এবং আমার মত ভাস্করের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাওয়াটাই তার সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক, তার অন্য কোন ফি-র প্রয়োজন নেই। যে জাতের লোকেরা অর্থের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে সয়তানের হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র দেখা যায় তাদেরই একজনের মুখ থেকে এই উক্তি বেশ কিছু বেখাপ্পা শোনাল।" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন "জান হে ছোকরা ফরাসীরা দানের

অর্থ বোঝেনা। এদের কেউ যদি কিছু এমনি উপহার দেবার চেষ্টা করে তো তার পিছনে কোন ফন্দি আছে ভেবে এরা গ্রহণ করবে না। তুমি পারমানতিয়ে এর গল্প শুনেছ?" না বলায় বল্লেন "ফরাসী মেনুর অমলেত পারমানতিয়ে নিশ্চয়ই খেয়েছে। এই অমলেতে এ ভাজা আলু থাকায় তাঁর নামকে উল্লেখ করা হয় কারণ ব্রেজিল থেকে ফরাসীদেশে আলু নিয়ে আসেন প্রথমে এক মঁসিয় পারমান্তিয়ে। বহুদিন বিদেশে থাকায় তিনি তাঁর স্বজাতির স্বভাবধর্ম্মকে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই দেশে ফিরে তিনি সকলকে ডেকে আলু বিতরণ শুরু করে দিলেন যাতে তারা খেয়ে জানতে পারে এই মুখরোচক আস্বাদকে। কিন্তু তাদের কেউই এই যেচে দেওয়া জিনিষকে নিতে প্রস্তুত হলনা। সহসা ম্যাসিয় পার্মান্তিয়ে-এর মনে পড়ে গেল কি উপায়ে তাঁর দেশবাসীকে আলুর আস্বাদের বশবর্ত্তী করা যায়। তিনি আলুগুলি নিজের বাগানে পুঁতে চারিদিক তারের জালের বেড়া তুলে নোটিশ টাঙিয়ে দিলেন "বাগানে প্রবেশ নিষেধ। মূল্যবান শব্জী বপন করা হয়েছে।" সেইদিন রাত্রে তাঁর বাগান লুঠ হয়ে সমস্ত আলু চুরি হয়ে গেল। তার পর থেকে ফরাসী জাত আলু খেতে অভ্যস্ত হয়েছে।" আমরা হেসে উঠলাম শুধু তাঁর রহস্যে নয় জিওভানেল্লির নির্দ্দেশমত চিকিৎসকের নিপুণ অভিনয়ে এবং এর জন্যে তাঁর বরাদ্দ চিকিৎসার পারিশ্রমিক ছাড়া আলাদা আর কোন ফি দিতে হয়নি।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃগনয়নী একবছর পরেও তাই ভাবছে, এই ত সেদিন প্রথম মদ খেয়ে এলো বনবিহারী। আজও মদ খেয়ে এসেছে। মৃগনয়নী কাঁদেনি, করুণা ভিক্ষেও চায়নি এর জন্যে কারো কাছে। না, কারো কাছে না। মাস আষ্টেক আগে এসেছে বুড়ী শ্বাশুড়ী আর প্রমদা সুন্দরী। ও বাড়ীতে এসেছে। ভাসুরের বাড়ী। এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত একবার দেখা করতেও আসেনি, এইটেই বনবিহারীকে আবার অস্থির করে তুলল।

ওরা আসবার দিন দশেক পরে বনবিহারী রাত্রে শুয়ে মৃগনয়নীর কাছে বললে,—মা একবার এলো না। মৃগনয়নী গম্ভীর হয়েই বললে—এলো না নয়, আসতে দিলো না।

—কে?

—তোমার বোন, আর নতুন বৌঠান।

—তাই বলে একবারও আসবে না?

—মৃগনয়নী বনবিহারীর কন্ঠে বেদনার আভাস পায়।

বলে,—তবে আমি কাল যাই।

—না।

—কেন, শ্বাশুড়ীর কাছে বৌ যাবে, এতে দোষের কি?

বনবিহারী রোগা শরীরটা ঝাঁজিয়ে ওঠে,—না। কক্ষণো যাবে না। কক্ষণো না। তাকে আসতে হবে, কদিন না এসে পারে দেখি।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। এর পরদিনই সন্ধ্যায় আবার বনবিহারী মদ খেয়ে ফেরে। আজও মৃগনয়নী ওকে ধরে এনে শোওয়ায়। শুয়ে বমি করে ফেলে বনবিহারী। মৃগনয়নী নীরবে সেগুলো পরিষ্কার করে—বনবিহারীকে শুইয়ে দেয়, পাখার হাওয়া করে। বনবিহারীর মুখে মদের ঝোঁকেও ওই আক্ষেপ।

—একবার দেখতেও এলো না! মরলুম কি বাঁচলুম একবার দেখবার দরকার নেই! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব!

মৃগনয়নীর ঠোঁট দুটো কঠিন ইস্পাতের পাতের মত। একটুও নড়ে না। সেই থেকে বনবিহারী আবার মদ ধরল। মৃগনয়নীর মনটা যে কখনও কখনও দুপুরে বেদনার তীব্রতায় না জ্বলে এমন নয়। কিন্তু কোথায় তার প্রকাশ নেই। কোথাও না।

মনে হয় পুঁটিদির কথা। দিদির কথা। তাদের কথা মনে হলে তার বেদনা আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে। পুঁটিদির চিঠিখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তিনমাস আগে এক নিস্তব্দ দুপুরে এলো চিঠিখানা। লালচে বালির কাগজ। দুপাশে ছেঁড়া। বড় বড় হরফে কি ভয়াবহ লেখা। অক্ষরগুলো যেন মাথার ভেতর থাকে। পুঁটিদির চিঠি। ছোট চিঠি অথচ কি সাংঘাতিক। পরিষ্কার খবর, একটু এদিক ওদিক করে লেখা নয়। সহজ করে লেখা। এমন ভীষণ কথা এত সহজ করে কেউ যে লিখতে পারে ধারণা করতেও কষ্ট হয়। পুঁটিদি কি পাষাণ হবে শেষে। পাথরের শিব পুজো করে করে পাথর হয়ে গেছে পুঁটিদি। কি নিষ্ঠুর ভাষা! কথাগুলো চোখের সামনে আবার দেখতে পায় মৃগনয়নী। পুঁটির হাতে বড়

বড় হরফে লেখা। "এ চিঠি কাহাকেও দেখাইও না। নায়েব মশাইয়ের বাড়ীর মেয়েদের মুখে শুনিলাম, মায়ের ও খুড়ীমার চোখের জলেও বুঝিলাম তরঙ্গিণী দিদির প্রসব খুবই গোপনে হইতেছিল। প্রসবে নিদারুণ যন্ত্রণা সুরু হয়। যন্ত্রণা বুকের উপর উঠিতে থাকে। চীৎকারের ভয়ে তাহার মুখ চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। তবুও নাকি জল খাইতে চাহিয়াছিল। কেহই জল দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত ধনুষ্টংকারের মত হওয়ায় তাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় হতভাগিনী মরিয়াছে। মরিয়া বাঁচিয়াছে। আমাদেরও বাঁচাইয়াছে। তবু খুড়ীমার চোখে জল দেখিলাম। মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলো। আমি হইলে কাঁদিতাম না।" পুঁটিদি কি পাষাণ! মৃগনয়নী দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছিল। অনেক কেঁদেছিল। দিদির মুখখানা চোখের সামনে থেকে কিছুতেই যেন যেতে চায় না। সেই মুখ। সেই কথা। 'একটু কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে খাওয়াবি?' 'আমি জানি তোরা আমায় ঘেন্না করিস। আমি অন্যায় ত' কিছু করিনি? চোখের জলে গাল ভেসে যায়। বার বার মনে মনে চীৎকার করে বলে, তোকে ঘেন্না করি না দিদি। বিশ্বাস কর। তোকে ভালবাসি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল মৃগনয়নী। অজস্র। তরঙ্গিণীর নীল ওষ্ঠাধর ম্লান মুখখানা ভেসে ওঠে আবার চোখের সামনে। কাশী নিয়ে যাবার আগে কি চেহারাই দেখেছিল মৃগনয়নী। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে এলো ও। মনে হোল বাবার কথা। বাবা নিশ্চয়ই এ খবর শুনেছেন। শুনে কি করলেন দেখতে ইচ্ছে হয়। দেখতে ইচ্ছে হয় বাবার মুখখানা। খবরটা হয়ত রাত্রে খেতে বাবার সময়ই পেয়েছিলেন। হয়ত ভাত আর খেতে পারেননি। নীরবে উঠে গিয়েছিলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ত' পড়েছিল। তারপর জপে বসলেন সমস্ত রাত। মৃগনয়নীর মনটা শীতল হয়ে আসে। ঠাণ্ডা শান্ত এক জোড়া চোখ স্নেহে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর বাবার চোখ। মন যখন আর নিজের বশে থাকে না। অশান্ত আবেগে নিদারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন একমাত্র রামতারণের চিন্তা ওকে শান্ত করে তোলে। কেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বুঝেছিল। অনেক পরে বুঝেছিল মৃগনয়নী। রামতারণের ওপর ওর পরম নির্ভরতা ওকে অত শান্ত করে। রামতারণের প্রশান্ত মনের ছোঁয়া লাগে ধ্যানের মাধ্যমে। এমনিই হয়।

একমাত্র ওই ধ্যানেই যেন মৃগনয়নী অনেকটা পায়। আর সবই বড় তুচ্ছ মনে হয় তখন। মনে হয়, এই ত' সেদিন ছিল, আজ নেই। পাওয়া আর হোল না। জীবনের এতগুলো বছর ঠিক-ঠিক পাওনা যে কোথায় তাই কি ছাই বুঝতে পারত মৃগনয়নী। শ্বিতীয় ছেলেটি হবার পর থেকে ওর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। তার ওপর সুরু হয়েছে বনবিহারীর অত্যাচার। অত্যাচারই ত? সকালে উঠে যখন বলে,—এত অত্যাচার করছ কেন বলত? বনবিহারী অপিস যাবার জন্যে তৈরী হয়। হাসে। বলে,—কই। কিছু ত' করিনি?

—ওই ছাঁই পাঁশ গিলে এলে কতকগুলো?

বনবিহারী চুপ করে থাকে। একটু কাছে আসে মৃগনয়নী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়েই।

—আর খেয়ো না ওসব।

বনবিহারী কথা বলে না। শুধু তাকায় একবার।

—বলো আর খাবে না?

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে জামাটা ধরে বনবিহারীর। ও ম্লান হেসে আবার তাকায়।

একটু অস্পষ্ট ভাবে বলে,—কি যে হয় সন্ধ্যেবেলা। মানে আমি কি ইচ্ছে করে খাই।

—কি হয়?

ছেলেটার গালে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলে বনবিহারী,—কি হয় আমি কি জানি? সন্ধ্যেবেলাটা মানে—।

মৃগনয়নী বলে,—সন্ধ্যের আগে না হয় চলে এসো।

—কাজ থাকে যে!

—তবে কাজ করেই চলে এসো।

—কাজ করে শরীরটার ভেতর কেমন যে করে?

—কেমন?

—মানে হাত পা যেন অবশ হয়ে আসে।

—তবে ডাক্তার দেখাও।

—ডাক্তার কি করবে। মানে ওই সময় একটু মদ খেলে বেশ তাজা লাগে।

—না, মদ খাবে না।

—সত্যি কথা বলব?

—বলো।

—মানে ওই মেজদাকে অপিসে দেখলেই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

—কেন, মেজ ভাসুর তার মত কাজ করুন, তুমি তোমার মত কাজ করো।

—তা নয়। আমি ক্যাসে কাজ করি। মেজদা টাকা নিতে আসে। ওকে দেখলেই—

—দেখলেই কি?

—মানে খুব রাগ হয়ে যায়।

—তারপর?

—তারপর কাজ শেষ হবার পর শরীরটা অবশ লাগে।

মৃগনয়নী বলে,—ও সব ছুতো। ইচ্ছে থাকলেই না খেয়ে বাড়ী চলে আসতে পারো।

—তাছাড়া—।

—তাছাড়া উপরী টাকাও থাকে পকেটে।

—ওইটেই আসল কথা।

বনবিহারী হাসে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসে। ছেলেটাকে কোলে নেয়। মৃগনয়নী আর কথা বলে না। গম্ভীর হয়ে থাকে। বনবিহারী আস্তে আস্তে জুতো পরে অপিসে বেরিয়ে যায়। কিযে করবে মৃগনয়নী কিছু ঠিক করে উঠতে পারে না। ও নিশ্চিত বোঝে যে কোন খারাপ সঙ্গে পড়েছে বনবিহারী। মানুষটা বড্ড সরল, ভাল মানুষ। অন্য কোন শয়তান লোক ওকে হাত করে ফেলেছে হয়ত। বনবিহারী কি নির্ভরই না করত মা কালীর ওপর। দেশে থাকতে অনেক কথাতেই মায়ের কথা বলে ফেলত। এখনও যে ওদিকটা একেবারে উঠে গেছে তা নয়। এখনও সকালে মায়ের পটের কাছে বসে। সন্ধ্যা গায়ত্রী করে মায়ের নাম করে। কিন্তু সন্ধ্যায় বোধকরি কিছুই মনে থাকে না। কারো কথা মনে থাকে না। কারো কথা নয়। শুধু এইই নয়। দিনকতক পরে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী বনবিহারীর ফিরতে বেশ রাত হয়। অনেক রাত্রে ছেলে দুটি ঘুম পাড়িয়ে দরজাটা খুলে অন্ধকার গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী। আরও বেশী রাত হলে দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনবার আশায়। গভীর রাত্রে বসে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়ে। হয়ত কোনদিন কমলির মা ঘর থেকে বেরোয় কলকাতায় যাবার জন্যে। অন্ধকারে ওকে ভাল করে ঠাওর করতে না পেরে পিছিয়ে যায়।

—কে ওখানে ?

মৃগনয়নী চমকে ওঠে। বুকটা কেঁপে ওঠে।

—আমি।

নারী কণ্ঠ শুনে আশ্বস্ত হয় কমলির মা।

—আমিটা কে বাছা ?

—আমি গো দিদি !

মৃগনয়নী এগিয়ে আসে। কমলির মা একটু সমীহ করে তাই রক্ষে। অন্য কেউ হলে চীৎকার করে বাড়ি ফাটাত। সমীহ করবার কারণটা আর কিছু নয়, মৃগনয়নী অনেক সময় ওকে দুচার আনা ধার দেয়। কমলিকে মাঝে মাঝেই খাইয়ে দেয়। সময়ে অসময়ে চাল ডালও ধার দিতে হয়। ধার শোধ আর হয় না। মৃগনয়নী জানে শোধ হবে না। গলাটা তাই একটু নরম করে বলে কমলির মা,—এত রেতে হেথায় কেন দিদি ? মৃগনয়নী হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না।

কমলির মা বলে,—বুঝেছি। কর্ত্তা বুঝি ফেরেনি এখনও ?

মৃগনয়নী কোনমতে বলে,—হ্যাঁ।

নিজের মনেই বলে কমলির মা,—ঝাঁটা মারো ! মিনষেগুলোর একটু আক্কেলও নেই গা। মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলে,—তুমি বরং ওপরে যাও দিদি, কড়া নাড়লে আমি দোর খুলে দোব। মৃগনয়নী আপত্তি জানালো,—থাক্, আমার ঘুম পাচ্ছে না। কমলির মা কলতলায় চলে যায় এবার। মৃগনয়নী বসে থাকে। কমলির মা আর কথা বলে না। ঘরে ঢোকে। খিল কিন্তু দেয় না। মৃগনয়নী বসেই থাকে। আরও অনেক পরে দোরে ঘা পড়ে। বুক কাঁপতে থাকে মৃগনয়নীর। কে জানে কি অবস্থায় এলো ! ভয়ে ভয়ে দরজাটা খোলে। বনবিহারীই এসেছে। টলছে দরজার চৌকাঠ ধরে। মৃগনয়নী সরে দাঁড়ায়। বনবিহারী ভেতরে ঢোকে। পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে। মৃগনয়নী অন্ধকারে একটু সময় দাঁড়ায়। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। খুব আস্তে আস্তে। কে জানে কমলির মা টের পেয়েছে কিনা ! ভাগ্যিস চেঁচায়নি বনবিহারী। চুপ করে উঠে গেল ওপরে। মৃগনয়নীও ওপরে গেল। বনবিহারী ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন গিয়ে মৃগনয়নী ধরল ওকে। জামাটা খুলে দিল। জুতো খুলল। বনবিহারী বিছানার ওপর বসে পড়ল। কাছে গিয়ে বসল মৃগনয়নী। বনবিহারী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু। হাসিটা বড় বিশ্রী। গাটা শিরশির করে ওঠে মৃগনয়নীর। একটু ইতস্তত করেও জিজ্ঞেস করে,—কোথায় ছিলে এতরাত ? বনবিহারী লাল চোখ-দুটো বড় বড় করে তাকায়। মৃগনয়নীর ভয় করে একটু। তবু আবার জিজ্ঞেস করে,—কোথায় ছিলে ?

—সত্যি শুনবে ?—আবার সেই রকম হাসি।

লাল টকটকে চোখে ক্রুর হাসি। এমন হাসি কখনও বনবিহারীর চোখে দেখেনি মৃগনয়নী। সরল মানুষ বনবিহারী। সহজ হয়ে হাসতে জানে। কিন্তু এ কি রকম ? মৃগনয়নী শঙ্কিত হলেও সহজ হবার চেষ্টা করে একটু হেসে বলে।—অপিসে ত' আর এতরাত অব্দি থাকো না ?

— না।

— তবে নিশ্চয়ই কারো বাড়ী যাও।

— তাই ত' যাই।

— সেখানে গিয়ে ওই ছাই পাঁশ গুলো গেলো।

— তাই গিলি।

— কার বাড়ী যাও শুনি ? অপিসের কোন বন্ধু ?

— না। তবে বন্ধু সঙ্গে থাকে।

আজ বনবিহারী খানিকটা প্রকৃতিস্থ আছে।

— বন্ধু কোনটি।

— এখানে কাছাকাছিই থাকে।

— নাম কি ?

— সুরেন বাবু। সুরেন নাগ।।

— তার কি কেউ নেই সংসারে ?

— একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। পরিবার মারা গেছে।

— আপদ গেছে। বেঁচেছে।

বনবিহারী আবার হাসে,—তার সঙ্গে কোথায় যাই জানো ?

— কোথায় ?

— মেয়ে মানুষের কাছে।

বুকের ভেতরটা যেন ভারি হয়ে ওঠে হঠাৎ। গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলে মৃগনয়নী,—তার নাম কি ?

— শোভা।

— কেন যাও ?

—সে তুমি বুঝবে না।

ঘৃণায় গায়ে কাঁটা দেয়। তবু এগিয়ে আসে বনবিহারীর কাছে।

বলে,—তাকে ভালবাস ?

— না, ঠিক ভালবাসা নয়।

— তবে কি ?

— একটা কেমন নেশার মত। ভাল লাগে যেতে। মৃগনয়নীর ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে, তখন আমার কথা মনে পড়ে না ? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ঘৃণা হয়। এ কথা সে মরে গেলেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। চোখ দুটো জ্বালা করে—কিন্তু জল আসে না চোখে।

ভাল করে দম নিতে পারে না। ঘেমে ওঠে মৃগনয়নী। পাশে ছেলে দুটি ঘুমোচ্ছে। ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বলে,—ওদের কথা মনে হয় না ? বনবিহারীর মুখটা একটু ম্লান হয়। বলে,— না কারো কথা মনে হয় না। কি যে হয় তখন তোমাকে বলতে পাচ্ছি না। বললাম ত' তুমি বুঝবে না।

— টাকা দাও তাকে ?

— হ্যাঁ দিই। অনেক টাকা দিই।

উপরির টাকা ঘরে বেশী আসে না। যা আসে তাতে মৃগনয়নীর সংসার চলে যায় বটে, কিন্তু জমে না।

— এর পরেও তুমি আমার কাছে আসতে পারো ? আমাকে বাঁচতে বলো !

বলতে বলতে মৃগনয়নী উঠে পড়ে। বনবিহারী ওর দিকে তাকিয়ে একটা হাই তোলে। তারপর শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশে একটি তারাও নেই। ঘোলাটে মেঘে ঢাকা আকাশ। মৃগনয়নী বাইরের দিকে মুখ রেখে বার বার চোখ মোছে। এর

পরেও তাকে বাঁচতে হবে। এই মানুষ নিয়ে তাকে সংসার করতে হবে। সকলের কাছে নিজের স্থান করে নিতে হবে। ঘৃণায় আর ভয়ে বারে বারে শিউরে ওঠে মৃগনয়নী। এই জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে তাকে আরও কত বছর কে জানে? কতকাল এমন করে কাটবে কে বলতে পারে? এতকালের আশা সব বিচূর্ণ হয়ে গেল বুঝি। এতদিনের ধৈর্য আর বুঝি রইল না। সংসারের অবধারিত নিয়মে এক গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে যেন মৃগনয়নী। তবু ভয় পেলে চলবে না। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। সংসারের এমন নিষ্ঠুর অবস্থাকে মেনে নেবে না মৃগনয়নী। কখনই নয়। কিছুতেই না।

কুড়ি

জীবনের এই সময়টায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল মৃগনয়নী। রামতারণের প্রশান্ত মনের ছোঁয়ায় পাওয়া যে ধৈর্য মৃগনয়নীর ছিল। তা যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। উঠবে না কেন? মৃগনয়নী পরে বুঝেছিল। ধৈর্য ভেঙে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়। মেয়ে মানুষের জীবনে চরম অপমান চরম বেদনাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। বেদনার এই গুরুভার ঠিকমত সয়ে উঠতে পারে নি। অন্যায় কিছু নয়। আশ্চর্যও নয়। তবু এ সত্য সে বুঝল কিছুদিনের ভেতরই যে বিদ্রূপ হয়ে লাভ কিছু হয় না। লোকসান ছাড়া। আবার শান্ত হয়ে এলো সে।

মাসকয়েক হোল বনবিহারীর সঙ্গে ও কথা বলতে পারত না ভাল করে। ইচ্ছে হোত না। ভাল লাগত না। নেহাৎ যে কথা না বললে নয়। সেই কথাটুকুই বলত। বনবিহারীও ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে যে খুব ব্যস্ত ছিল তা নয়। মৃগনয়নীর গাম্ভীর্যটা লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থাই হয়ত ছিল না। সকাল বেলা বেরিয়ে যেত। আপিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ওই সন্ধ্যাটুকুর জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে থাকত। ওই সন্ধ্যাটুকুই ওর সমস্ত মনকে কখনও সমস্ত চিন্তাকে ভরে রেখেছিল। মৃগনয়নীর দিকে নজর দেবার সময়ই বা কোথায়? তবু কখনও কখনও সকালে উপরী টাকা থেকে মৃগনয়নীকে যখন কিছু টাকা দিত। তখন হয়ত বলত।—আজ রাত্রে একটু মাংস রেঁধো। মৃগনয়নী টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত কিছুক্ষণ।

হয়ত বলত গম্ভীর মুখেই,— রাত্তিরে কি আজ খাবে?

— কেন খাবো না?

— মাঝে মাঝেই ত' খাও না।

— বনবিহারী হাসত।—মাঝে মাঝে! কি যে বলো! মাসে দু একদিন হয়ত খাই না।

কথাটা সত্য নয়। মৃগনয়নী বুঝেও কিছু বলত না। বৃথা কথা বলার আর প্রয়োজন নেই। মনের কোথায় যেন একটা জ্বালা অনুভব করত শুধু। এই জ্বালাটাই সব চেয়ে কষ্ট দিচ্ছে ওকে আজকাল। কথা কম বলছে তাই রক্ষা, নইলে হয়ত ফেটেই পড়ত অনেক আগে। তবু শেষ রক্ষা করতে পারল না। একদিন অনেক কথা বলে ফেলতে হোল।

সেদিনটা নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ওর জীবনে। কিছুই হয়ত হোত না, যদি না সুরেনবাবু আসত সেদিন আর তার পেছনে একটু দূরে গাড়ীতে বসে থাকত সেই মেয়েটা—শোভা। সেদিন অপিসের অতিরিক্ত কাজেই হয়ত বনবিহারী সুরেনবাবুর কাছে যেতে পারেনি। হয়ত সুরেনবাবু অনেক সময় অপেক্ষা করে একেবারে বাড়ীতেই খোঁজ করতে এসেছে। গাড়ীতে রয়েছে মেয়ে মানুষটি। ইচ্ছেটা বনবিহারীকে তুলে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে। বনবিহারী যে পরিমাণ টাকা ঢালছে আজকাল, তাতে ওকে এক সন্ধ্যাও উপেক্ষা করা চলে না।

সুরেনবাবু একটু মত্ত অবস্থাতেই এসেছিল। একটু ভুল করেছিল সুরেনবাবু। সেটা ধরা পড়ল কিছুক্ষণের ভেতরেই। সুরেনবাবু লোকটি খুব পাতলা। একটু দুর্বলও যেন। চলতে চলতে পায়ের টাল সামলাতে পারছিল না। দোরের সামনে এসে কড়া নাড়ল। মোটা ভাঙ্গা গলায় ডাকল।—বনবিহারী আছো হে! বনবিহারী। মৃগনয়নী ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে বড়টিকে পড়তে বলছিল। কমল কিছুতেই পড়বে না। খিদে পেয়েছে। খেতে চাইছে। সন্ধ্যা থেকে মনটা ভাল নেই। কমলের দিঠে দু চার ঘা দেবে কিনা চিন্তা করছে এমনি সময় ডাকটা কানে এল। নীচে নেমে দোরের কাছে এল। মটকা ঢলঢলে পাঞ্জাবী পড়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল সুরেনবাবু। দোরের একেবারে সামনে চলে এল মৃগনয়নী। মাথায় ঘোমটা নেই। হয়ত বা খেয়াল ছিল না। বললে,— কাকে চাইছেন?

— বনবিহারী আছে?

মুখের গন্ধটা বাতাসে ভেসে নাকে আসতেই টের পেল, মাতাল।

— না, উনি নেই।

বলে কি খেয়াল হল মৃগনয়নীর একটু মুচকী হেসে বললে।— আপনিই বুঝি সুরেন বাবু? সুরেনবাবু বিগলিত হয়ে বললে,—ধরেছেন ঠিক। আমিই সুরেনবাবু।

— আপনার সঙ্গে বুঝি আজ ও বেরোয় নি।

—রাম বলো! তবে কি আর এখানে আসতুম! বনবিহারী কই? লুকিয়ে আছে বোধ হয়?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থাকে। মাথার তালুটা জ্বলতে থাকে ওর। সুরেন মৃগনয়নীর রক্তাভ মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে বলে,—আপনিই বুঝি বনবিহারীর ইয়ে মানে ওয়াইফ মানে গিয়ে স্ত্রী? মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। হঠাৎ বলে,—একটা কথা বলব আপনাকে?

— বলুন। বলবেন বই কি!

— আমার স্বামীকে আপনি নষ্ট করছেন কেন বলুন ত'?

— আমি?— একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায় সুরেনবাবু,—মানে আমি! ওই ত' নিজে নিজে ইয়ে করে। বিশ্বাস না হয় ইয়েকে জিজ্ঞেস করুন।

— কাকে?

— ওই যে গাড়ীতে বসে আছে। শোভাকে।

মৃগনয়নীর মাথাটা ঘুরে যায়। মেয়ে লোকটিও এসেছে?

বলে মৃগনয়নী,— ওঁকে একবার ডেকে দেবেন?

— নিশ্চয়ই। এ আর বলতে?

সুরেনবাবু টলতে টলতে গিয়ে গাড়ীর সামনে কি বলে। একটু সময় বচসা শোনা যায়। তারপর একটি মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। বয়স খুব বেশী নয়। সুশ্রী বলা যায়। দামী শাড়ী। গা ভর্তি গয়না। আসতে আসতে সুরেন বাবুকে জিজ্ঞেস করে,—কে ডাকছে?

— ওই যে ইয়ে। যাও না?

সামনে মৃগনয়নীকে দেখে মেয়েটি চমকে ওঠে। ও বোধহয় ভেবেছিল বনবিহারী ডাকছে। নিশ্চয়ই সুরেনবাবু ভেঙে বলেনি কে ডাকছে। মৃগনয়নী একটু এগিয়ে খপ্ করে ওর হাতটা ধরে বলে,— এসো দিদি। মেয়েটির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অবাক হয়ে তাকায়। একটু বা ভয়ও পায়। ব্যাপারটা একটু একটু বুঝতে পারে ক্রমশঃ।

— এসো ভেতরে। — মৃগনয়নী ওকে টানে।

মেয়েটি জোর করে বলে এতক্ষণে,—না, ভেতরে যাব না। আপনি কে? মৃগনয়নী হাসে,—এসো না? ভয় নেই। ওকে নিয়ে প্রায় জোর করে দোতলায় নিয়ে আসে। ওপরে ঘরে এসে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে।

— বোস।

— না।

— রাগটা কিন্তু উল্টো হচ্ছে। আমারই তোমার ওপর রাগ হবার কথা।

— কেন?—মেয়েটি এবার ভ্রূ কোঁচকায়।

— কেন নয়।

বলে, একটা নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী।

বলে,— আচ্ছা সংসার ভাঙাই বোধহয় তোমার কাজ?

— কি বলতে চান আপনি?— মেয়েটি এবার ফোঁস করে ওঠে।

— বলতে চাই কতগুলো আজ পর্যন্ত ভেঙেছ?

মেয়েটি বেশ নির্ভীক ভাবেই ঠোঁট উল্টে বলে এবার,— অনেক। কিন্তু আমাকে ডেকে এনে এসব কথা বলবার মানে?

— মানে আমার স্বার্থ রয়েছে পুরোপুরি।

— কথাটা খুলে বললে ভাল হয়।

মৃগনয়নীর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে,— বলব বলেই ডেকেছি। বনবিহারীবাবুকে তোমার ছাড়তে হবে। মেয়েটা মৃগনয়নীর দিকে তাকায়। একটু চমকায় হয়ত বা কিন্তু পর-মুহূর্তে সেও কঠিন স্বরেই বলে,— কেন, আপনার হুকুমে?

— হ্যাঁ। আমার হুকুমে।

মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে মেয়েটিও এবার একটু হাসে। হেসে নিজের চুড়িগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে বলে। — এগুলো বনবিহারীবাবু গেল মাসে গড়িয়ে দিয়েছে। চুড়ির ঝিলিক তীক্ষ্ণ ঝক্‌ঝকে ফলার মত বেঁধে মৃগনয়নীর বুকে। মেয়েটি বলে,— এর পরেও ওকে ছাড়তে বলেন?

— হ্যাঁ। বলি। আমার সর্বনাশ করে তোমার কি লাভ?

— লাভ? ওই যে বললুম। চুড়ি বারগাছা প্রায় দশভরি।

— শুধু সোনা আর টাকা?

— হ্যাঁ তাইই।

— বেশ, তবে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। মাসে মাসে এসে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও। আমার সব গয়না নিয়ে যাও।

— কি, ভিক্ষে?

— ভিক্ষে নয়। তোমার দয়া পাবার আশায়।

মেয়েটি বলে,— দয়া আমরা করতে ত' শিখিনি ভাই। ও সব কথা প্রায় ভুলেই গেছি। আচ্ছা, চলি মৃগনয়নী আটকায় ওকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে মৃগনয়নী।

তুমি কি চাও বলো?

মেয়েটি বেশ সহজ ভাবেই বলে,— বনবিহারী বাবুকে চাই। মৃগনয়নী ফুঁসিয়ে ওঠে।— পরের মানুষ নিয়ে তোমরা ব্যবসা কর। লোকের সর্বনাশ করে ব্যবসা করো। তোমাকে দেখে ঘৃণা হচ্ছে। তবু অনুরোধ করছি,—।

— অনুরোধ করবেন না। শুধু ঘৃণাই করুন।

মৃগনয়নী আরও কি বলতে যাচ্ছিল, থমকে যায়। মেয়েটি এগোয়। বলে,— সামনের মাসে আপনার চাল কেনবার টাকাও যাতে ঘরে না আসে, সে ব্যবস্থা করতে ভুলব না। মৃগনয়নী আর কথা বলতে পারে না। অসহায় চোখদুটো মেলে তাকিয়ে থাকে। বেরিয়ে যায় মেয়েটি সগর্বে। বেরিয়ে যাবার পর অনেক্ষণ নড়তে পারে না মৃগনয়নী। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। মাথাটা কেবলি ঝিম্‌ঝিম্ করে। ঘরে এসে জল খায় এক গেলাস। দেখে বড় ছেলে কমল খিদেয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পাশেই শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বুকের কাছে এনে চেপে ধরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃগনয়নী। কেন সে সেধে ঘরে অপমান ডেকে আনল? কেন সে একটা বেশ্যার কাছে এত কথা শুনল? সংসারে বিচার নেই। ফুলে ফুলে কাঁদে মৃগনয়নী। কমল ঘুম থেকে জাগে। মাকে বলে,—কাঁদছ কেন মা? আরও কাঁদে মৃগনয়নী। কমল মাকে জড়িয়ে ধরে।

কখন যে দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি ওরা। বনবিহারীর গলার আওয়াজ শুনে মৃগনয়নী জাগে। বনবিহারী জামাটা খুলতে খুলতে বলে।—উঃ! অপিসে আজ যা কাজ পড়েছিল! মৃগনয়নী তাকায়। কথা বলে না। মনে মনে একটু শংকিত হয়। রান্না কিছু হয়নি এখনও। কি খাবে বনবিহারী? খিদের সময় খাবার পাবে না, এটা কি ঠিক হবে? রান্না সে করতে পারবে না। থাক না খেয়ে। তার একটু মায়া নেই আর। তীব্র অভিমানে চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। বনবিহারী জামা খুলে একটা বিঁড়ি নিয়ে বসে।

— গামছা দাও।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে।

— কই গামছাটা দাও। হাতমুখ ধোব?

মৃগনয়নী কথা বলে না।

— কি হোল তোমার?

মৃগনয়নী নীরব।

একটু রেগে ওঠে বনবিহারী।—নাঃ! খেটেখুটে এসে এমন হাড়ির মত মুখ দেখতে ভাল লাগে না।

এবারে বলে মৃগনয়নী।—যার মুখ দেখতে ভাল লাগে, সেখানে গেলেই পারতে?

চটে ওঠে বনবিহারী।—সেখানেই গিয়েছিলাম, তাকে পাইনি বলেই এসেছি।

— কি করে পাবে? সে যে এখানে এসেছিল।

— তাই নাকি?— বনবিহারী হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল।—এসেছিল?

— হ্যাঁ। — মৃগনয়নীর স্বরটা খুব রুক্ষ।

— খোঁজ করেছিল বুঝি?

— হুঁ।

— সঙ্গে কে ছিল?

— সুরেন মাতাল।

— খেয়েই এসেছিল?

বনবিহারীর চোখে এক কদর্য লোভের জ্বলজ্বলানি লক্ষ্য করে মৃগনয়নী।

— কিছু বললে বুঝি?

মৃগনয়নী ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে।—আমিই বললুম।

— তুমি কি বললে?

মৃগনয়নীর ওর এত আগ্রহে হঠাৎ চটে যায়।—আদর করে এনে ঘরে বসালুম ভেবেছ বুঝি? লোকটা যে আমার হাতে মার খায়নি এই ভাগ্যি।

— মার! তুমি মারবে?

— হ্যাঁ। কেন মারব না? আর কত সইতে বল? বেশ্যাটিকেও ভেবেছিলাম ঘরে বন্ধ করে মারব। মায়া হোল তাই ছেড়ে দিলাম।

— শোভাকে নিশ্চয়ই অপমান করেছ?

— তবে কি ভালবাসব।

বনবিহারী এবার গর্জে ওঠে। — আলবত ভালবাসবে। আমি যাকে ভালবাসি তাকে তোমার ভালবাসতে হবে।

ঘৃণায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে মৃগনয়নী বলে,— তুমি ভালবাস। আমার সামনে বলতে লজ্জা হোল না?

— কিসের লজ্জা। যাকে ভাল লাগে। মিথ্যে খারাপ লাগে বলতে যাব কেন?

মৃগনয়নী মুখ ফিরিয়ে রইল।

বনবিহারী বলে।— কি অপমান তাকে করেছ বলো?

— বলব না।

— বলতে হবে।

— কিছুতেই বলব না।

— তোমার ঘাড় বলবে। বল বলছি।

মৃগনয়নী নীরব।

— বলো?

চুপ করে আছে মৃগনয়নী।

— ভয়ানক খারাপ হবে বলছি?

তবুও কথা নয়।

— খুন করে ফেলব।

একটা রা নেই মৃগনয়নীর মুখে।

বনবিহারীর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় এতক্ষণে।

— তবে রে।—বলতে বলতে মৃগনয়নীর নাক আর মুখের ওপর বেশ জোরে গোটা কতক চড় মেরে বসে।

ক্রমশঃ

কৃষক-নারী

সিগ্‌নালম্যান ডাবল্‌, এফ, এম্‌, হাইড্‌

সিঁদুর-বরণ লাল শাড়ী-পরা রমণীরে দেখেছিনু,
হল্‌দে বাড়ির নিকটে দাঁড়ায়ে শূন্য ইসারা করে।
পড়ছিলো খসে কালো অলিভেরা ঘুমন্ত সব রুপালি বৃক্ষ হতে,
মাটির মতন ধূসর হস্তে ধরছিলো নারী খসে-পড়া ফলগুলি।
কুড়োতে কুড়োতে আপনার মনে গাইছিলো বালা গান,
ধূসর গিরির ঘন কুয়াশারে উপহাস করিবারে,
কামান-গোলার ভূমিকম্পনকে করিবারে বিদ্রূপ।

অনুবাদ। **সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**

প্রেম

শিবশম্ভু পাল

আযৌবন তোমাকে চেয়ে চেয়ে
মুহূর্তকে আকুল করে তুলি;
একটি চাওয়া চক্ষু দুটি ছেয়ে
স্বপ্ন হোল সুরের ছোঁয়া পেয়ে,
তোমার কথা কেমন ক'রে, মেয়ে,
অনেক কিছু ভোলার মত ভুলি!

নাইবা তুমি রাখলে হাতে হাত,
একাই যদি জ্যোৎস্না-নীল রাত
ফুরিয়ে দিই, কোনই খেদ নেই;
চেয়েছি আমি শুধুই তোমাকেই,
নিত্য তাই ব্যাকুল-হওয়া এই
হৃদয়-স্বার প্রতীক্ষায় খুলি।

আসবে না কো, চাওয়ার সাথে পাওয়া
মিলবে না কো, তবুও কোন আশা
আনন্দের ক্লান্তিহরা হাওয়া
বইয়ে দেয়, তারই মাঝে বাসা
বাধলো একী অবাক ভালোবাসা!
স্বপ্ন তাই হয়না ম্লান ধূলি॥

বাঙালীর প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব

সার্বজনীন দুর্গোৎসব' — এই কথাটার সঙ্গে আমাদের চোখ কান বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। সার্বজনীন বা সর্বজনীন কথাটির যথার্থতা নিয়ে বৈয়াকরণিকগণ যতই তর্কজাল বিস্তার করুন না কেন, ও কথাটিতে এখন আর আমরা অবাক হই না। অথচ এই কথাটির বয়স খুব বেশী নয়! মাত্র একশো দেড়শো বৎসর আগেও এই সার্বজনীন কথাটার সঙ্গে বিশেষ কেউ পরিচিত ছিল না। এইখানে অনেকের ভুরুই কুঁচকে উঠবে, জানি, দুর্গোৎসব ছিল, মিলেমিশে পুজো হতো, অথচ সার্বজনীন ছিল না? এ কেমন কথা? ঠিক তাই, বারোজনে মিলিমিশে দুর্গোৎসব বাঙালীর অনেকদিনের পুরোনো ব্যবস্থা, তবে তখন এর যা নাম প্রচলিত ছিল, এখন বর্তমানে তা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। সে নামটি হচ্ছে বারোইয়ারী বা বারোয়ারী। এই বারোইয়ারীর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন হুতোম তাঁর বিখ্যাত বই 'হুতোম পেঁচার নক্শায়।

"বারোজনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পুজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়। ক্রমে সেই অবধি মা ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ার দলে গিয়ে পড়েন। মহাজন গোলদার দোকান্দার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পুজোর প্রধান উদ্যোগী।"

হুতোমের আমল থেকেই দেখা যায়, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাঙালীর দুর্গোৎসব রাজা, জমিদার ও বনেদী গৃহস্থের চক্‌মিলান প্রাসাদ থেকে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী এবং সেখান থেকেও আরো এগিয়ে এসে বারোইয়ারী তলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আর এই বারোইয়ারী শব্দটাই একটু রূপ বদলে গণতান্ত্রিক করে সার্বজনীন নামে প্রচলিত হয়েছে। আজ আর তাই বারোয়ারীর নাম কানে আসে না। সার্বজনীনের এখন ভরা যৌবন কাল, অতএব চারদিকে এখন তারই জয়জয়কার। মাঠে ঘাটে, অলিতে গলিতে, পার্কে, এমন কি বাড়ীর রোয়াকে সব জায়গায়ই আজ সার্বজনীন দুর্গোৎসব। দুর্গাপুজা—রাজসিক পুজা। বাংলা দেশে দুর্গাপুজা প্রাচীনতম উৎসব না হলেও শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব।

দুর্গাপুজার পৌরাণিক কাহিনী বাঙালী কালচারে কোনদিনও খুব বেশী স্থান পায়নি। কারণ উত্তরাপথের আর্যাবর্ত থেকে তথা বৈদিক সভ্যতার প্রভাব থেকে বাঙালী চিরদিনই সযত্নে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে এসেছে। অনেক কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় স্বতন্ত্রতার মত এই দুর্গাপুজাও বাঙালীর একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে চলেছে.

সুদূর অতীতে, ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল আমলেই বাংলা দেশে শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। কথিত আছে, রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শে তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রথম দুর্গাপুজা করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাদুড়িয়ার (রাজসাহী) রাজা জগৎ নারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। এরপর থেকেই বাংলার ধনী সমাজে ও বাংলা দেশে দুর্গোৎসব প্রচলিত হয়।

তারপর, দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্গোৎসবের পরিবর্তন

ঘটেছে। কিন্তু ঠিক কবে থেকে মা দুর্গা ধনীর দুর্গাদালান থেকে বেরিয়ে এসে বারোজনের সঙ্গে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সঠিক বলা শক্ত। পুরোনো দিনের কাগজপত্রে এ সম্পর্কে কিছু কিছু আভাষ মাত্র পাওয়া যায়। তবে অনেকে বলেন, নদীয়া জেলার শান্তিপুরেই নাকি সর্বপ্রথম এই বারোয়ারী দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আজ যেখানে শান্তিপুর থানা রয়েছে, তারই একটু পেছনে পঞ্চবটী বন নামে একটা জায়গা আছে, —এইখানেই নাকি বারোয়ারী দুর্গোৎসব হয়েছিল। তখন গঙ্গা নদী আরও নিকটে ছিল। দেবীর পূজার জন্য পঞ্চবৃক্ষের শাখা স্থাপন না করে, মূল বৃক্ষেই রোপন করা হয়েছিল। আর তার ফলেই সেদিনের সেই পঞ্চবৃক্ষ আজ ঘন সমাচ্ছন্ন পঞ্চবটী বনে পরিণত হয়ে পুরোনো কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই বারোয়ারী দুর্গোৎসবের উদ্যোগ আয়োজন করতেই নাকি দীর্ঘ সাত বৎসর সময় লেগেছিল এবং পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই সময়ও টাকার অঙ্ক যদি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে শান্তিপুরবাসীদের এই দুর্গোৎসব কত আড়ম্বরের মধ্যে যে সম্পন্ন হয়েছিল, তা আজকের দিনে চিন্তা করলে অবাক হতে হবে।

দেবী প্রতিমাখানি নাকি ষাট হাত উচ্চ হয়েছিল। কুমোরেরা ভারা বেঁধে উঁচুতে উঠে প্রতিমার ভ্রূ, চোখ প্রভৃতি এঁকেছিল। প্রতিমার এক একটি ভ্রূর মাপই ছিল আড়াই হাত! গ্রামের সবচেয়ে বড় মাটির জালাটি দিয়ে নাকি গণগতির বিরাট উদরটি তৈরী করা হয়েছিল। এই বিরাট প্রতিমার পূজা করতে এসে কিন্তু পুরোহিত মশাইদের বিপদে পড়তে হয়েছিল, দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়ে পুরোহিত আর প্রতিমার নাগাল পাচ্ছিলেনা, শেষে একটি চৌকীতে কপিকল লাগিয়ে পূজোর উদ্যোগীরা পুরোহিত মশাইকে উপরে তুলে পূজার কাজ নিষ্পন্ন করেন।

প্রতিমার বিরাটত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই দেবী পূজার উপকরণ ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শান্তিপুরের সমস্ত ময়রা ও হালুইকরেরা কয়েকদিন ধরে একটুও বিশ্রামের অবকাশ পায়নি। শত শত যুবক সারা দিন রাত্রি ধরে প্রসাদ বিতরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট বারোইয়ারী দুর্গোৎসবের সংবাদ সারা জেলা ও আশেপাশের জেলা ও শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক শান্তিপুরের এই বিরাট দুর্গোৎসব দেখতে শান্তিপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আর শান্তিপুরবাসী তাদের আদর আপ্যায়নে ত্রুটি করেনি। পূজোর আসর সদাসর্বদাই সরগরম রেখেছিল গ্রামের যাত্রাগান, কবিগান, তরজা, পাচালী ও কীর্তনের দল। শত শত ঢাকীর ঢাকের শব্দে কয়েকদিন ধরে সারা শান্তিপুরবাসীর শান্তিতে ঘুম হবার উপায় ছিল না আর তাদের সে অবসরও ছিল না। সমস্ত গ্রামবাসীকেই এই বিরাট কর্ম যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এই দুর্গোৎসবের চার দিনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সবখানিই খুশী ও আনন্দের, কিন্তু বিজয়ার দিন এমন একটি সমস্যা দেখা দিল, যার ফলে শান্তিপুর বাসীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এই বিরাট প্রতিমাকে কি উপায়ে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? বারোইয়ারীর কর্মকর্তারা নানা কৌশল করে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হায়, সবই ব্যর্থ হল। প্রতিমাকে একচুও সরানো গেল না! এদিকে ক্রমেই বিসর্জ্জনের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, শেষে নিরুপায় হয়ে সেই বিরাট প্রতিমাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হল। শান্তিপুরবাসীদের এই বিরাট বারোইয়ারী দুর্গোৎসব তথা বাঙালীর প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব সেদিন এইভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।

সলিলপ্রসাদ ঘোষ

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

বাঙলা সাহিত্য ও অনুবাদ

কিছুদিন আগে প্রাগবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুসান্ জ্ভাবি টেল্ কলিকাতায় এসেছিলেন। ডক্টর ডুসান্ দশটি ভাষায় সুপণ্ডিত। বাঙলাভাষার প্রতি এঁর নিষ্ঠা আমাদের বিস্মিত করে। দীর্ঘকাল যাবৎ একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ে ইনি বাঙলা থেকে একাধিক গ্রন্থ চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বাঙলা সাহিত্যকে যে মর্যাদা ইনি দিয়েছেন, বাঙালী হিসাবে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে ডক্টর ডুসান্ রবীন্দ্র রচনাবলীর পাচটি খণ্ড অনুবাদ করেছেন (দুটি প্রকাশিত), এ ছাড়াও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', বিভূতি ভূষণের 'পথের পাঁচালি', তারাশঙ্করের 'কবি' আধুনিক ছোটগল্প ও কবিতার সংকলন, মৈমনসিংহ গীতিকা, বনফুলের 'বৈতরণীর তীর' ইত্যাদি মূল বাঙলা থেকে অনুবাদ করেছেন। বাঙলা-জায়া আজ বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বীকার করি, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সহস্রশীর্ষ রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

আর একটি সংবাদ। সাহিত্য আকাদামির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার একটি সংকলন প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। দেবনাগরী লিপিতে লেখা মূল বাঙলা রচনাও প্রকাশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে এগুলি প্রকাশিত হবে। তিব্বতী ও নেপালীভাষাতেও রবীন্দ্রনাথের রচনা সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত আকাদামি গ্রহণ করেছেন। আশা ও আনন্দের কথা। তবু বক্তব্য থেকে যায়।

বাঙলাসাহিত্য জন্মমুহূর্তের পর থেকে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে নানা রূপ বদল করে আধুনিক স্তরে এসে পৌঁছেছে। বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস। যদিও সর্বাধুনিক স্তরে এসেছে মাত্র কিছুকাল পূর্বে। বাঙলা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে আরো পরে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মিশনারী ও ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্যসাহিত্য উন্নীত হয় ও বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে। এরপর বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমের হাতে গড়ে বাঙলাসাহিত্য নবরূপ লাভ করে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এখনো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, বাঙলা সাহিত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, সবল। এত দ্রুত উন্নতি বিস্ময় উৎপাদন করে। বাঙলা গদ্যের ইতিহাস প্রাচীন। মাইকেল এসে দিকপরিবর্তন করেছেন, তাছাড়াও একাধিক সার্থক স্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাঙলাসাহিত্যে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। বিশেষভাবে ভাগবত-রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। হয়ত সর্বত্র অনুবাদ সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। তবু এ উদ্যম প্রসংসনীয়।

অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যে বিষয়বিস্তার হয়। বিভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভাব-বিনিময় এবং অন্তরঙ্গ যোগসাধন হয়। মধ্যযুগে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙলাসাহিত্যের সম্পদ

প্রচুর পরিমাণে বেড়ে উঠেছে। তখন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার অপ্রতুল। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনাশ্রয়ী কিছু রচনা মাত্র আমাদের সম্বল। অনুবাদের প্রয়োজন ছিল তখন। প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যই এ বিষয়ে আমাদের অভাব দূর করতে সমর্থ হয়েছে।

মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য একাধিক ভাষা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও খুব কম লোকই জানেন। একমাত্র বহুল প্রচারিত ইংরেজী ভাষা, যা শিখতে হয়েছে উচ্চশিক্ষালাভের জন্যে, কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে—অধিকাংশ ভারতীয়কেই। বর্তমানে, অন্যান্য বিদেশী ভাষার মধ্যে ফরাসী, জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূল ভাষায় সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ, অনুবাদে অনেক পরিমাণে সে রস ব্যাহত হয়। তবু আমরা অধিকাংশ সাহিত্য-পিপাসু বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রসাস্বাদন করি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। মূল রচনার ভাবৈশ্বর্য ও প্রসাদগুণ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলেও লেখকের মানস সংগঠন ও রচনাশৈলীর কিছু পরিচয় অবশ্য পাই। মোঁপাসা-শেকভ-বালজাক্-গোগোলকে জানতে পারি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে।

এখন প্রয়োজন বাঙলাসাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদ। প্রথমতঃ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাঙলাগ্রন্থ অনুবাদ করা প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণকে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বাঙলা-সাহিত্যের রসাস্বাদন করানো প্রয়োজন।

অতঃপর ইংরেজী ভাষায় বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ করতে হবে। বাঙলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার হবে সাহিত্যিকের উপকার হবে। তারা তাদের শ্রম, নিষ্ঠা ও সাহিত্যসেবার পুরস্কার পাবেন। ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক।

সর্বক্ষেত্রে ভাষানুবাদের প্রয়োজন করে না, ভাবানুবাদের কাজ হয়। অনুবাদের সুবিধার জন্যে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য মূলের প্রতি সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে। অন্যথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

বাঙলা সাহিত্য হৃদয়প্রধান মনকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বলছি না যে বাঙলা সাহিত্যে যুক্তিকে, মস্তিষ্ককে পরিহার করে চলা হয়। হৃদয়প্রধান সাহিত্যের একটি সুবিধা আছে। সর্ব-কালে, সর্বদেশে, সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার মনে এর এক বিশেষ আবেদন আছে। যে গ্রন্থে বাঙলা দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে, সে গ্রন্থের অনুবাদের সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অস্পষ্টতা, দুরূহতা দুর্বোধ্যতা বর্জনের চেষ্টা করতে হবে। বাঙলার মাটি, নদী-নালা, প্রান্তর অরণ্য, বাঙলার আচার-সংস্কার যে গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে গ্রন্থ শেষে টীকা বা ব্যাখ্যা সংযোগের ব্যবস্থা করলে পাঠকের সুবিধা বাড়বে, কৌতূহল নিবৃত্ত হবে। বাঙলার গণ্ডীবদ্ধ সীমিত সমাজ-জীবনের কথামাত্র যে গ্রন্থের সম্বল, যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে গ্রাম্যীন কলহ, তেমন গ্রন্থের অনুবাদে প্রয়োজন নেই।

সর্বাগ্রে সুগ্রন্থ-চয়ন করতে হবে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনুবাদেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। যে গ্রন্থের আবেদন শাশ্বত, চিরন্তন, তাকেই শীর্ষস্থান দিতে হবে। এক্ষেত্রে বন্ধু তোষণ, পক্ষপাতিত্ব, ও গোষ্ঠীপোষণ নীতি সর্বতোভাবে পরিহার করা কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষার সাহিত্যের মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের সম্মান ও গৌরব বাড়াবার কথাও মনে রাখতে হবে।

বাঙালী সমালোচক বা প্রাবন্ধিক যদি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের অগ্র-গতির ধারা তুলে ধরেন, তাহলে আমাদের সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠক পাওয়া যাবে।

ব্যাপক অনুবাদের ভার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি

প্রকাশক শ্রেণী এবিষয়ে তৎপর হন, তাহলে এবিষয়ে দ্রুত কাজ হবার সম্ভাবনা। সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্র যদি এ ভার গ্রহণ করেন, তাহলে সুষ্ঠুভাবে কাজ হতে পারবে। রাষ্ট্র সাহায্য করবে, নিয়ন্ত্রণ নয়। একটি অনুবাদ বিভাগ করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ করে সুলভে বিদেশে প্রচার করবার ব্যবস্থা করলে আমাদের আশা পূর্ণ হয়। ঘরের ছেলের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহে আমরা অন্ধ, তার প্রতি অনুরাগ তো থাকবেই। পরের বাড়ীতে পাঠিয়ে সেখানে পাশাপাশি দেখে তবেই না তাকে যাচাই করা যাবে। ঘরে বসে বড় মুখ করে বারবার বলি, বাঙলা সাহিত্য আজ এত উন্নত যে, বিশ্বসাহিত্যে তার এক বিরাট স্থান। এ বৃথা দম্ভের কোন লাভ নেই। এদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিককে জগৎ সভায় পরিচিত করতে হবে। অন্যান্য শিল্পে বাঙালীর উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় বিদেশ পেয়েছে এবং উচ্চ প্রশংসা ছাড়াও, পুরস্কৃত করেছে। যেমন চলচ্চিত্র, নৃত্য, যাদুবিদ্যা।

বিদেশীর কাছে আজো পর্যন্ত একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকারের কোন প্রশ্ন ওঠে না বা তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আমরা আমাদের সাহিত্য তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না। আমাদের ভাষা শিক্ষা করে আমাদের গ্রন্থ পাঠ করবেন, এমন বিদেশী সংখ্যায় কম।

রবীন্দ্রনাথেই বাঙলা সাহিত্য শেষ নয়। তাঁর দানে এ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে কিন্তু থেমে থাকেনি। কল্লোল ও উত্তর-কল্লোলের সাহিত্যিকদের হাতে বাঙলাসাহিত্য আরো উন্নত হয়েছে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ও সমালোচনায় আজ বাঙলা সাহিত্য অনেকাংশে রবীন্দ্র প্রভাব-মুক্ত। প্রতি সজীব ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমিক পরিবর্তন ও নবরূপ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ সাহিত্যের পরিচয় বিদেশীরা তেমন জানে না। বাঙলাদেশেও এমন কবি-সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের রচনা সু-অনূদিত হয়ে নোবেল কমিটির হাতে পৌঁছলে তাঁরা যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে বাধ্য হবেন। তাঁদের পক্ষপাতিত্বহীন সুবিচারে বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে পুনরায় নোবেল পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে। উনিশশো তেরোর গণ্ডী কাটাবার প্রয়োজন খুব বেশী করেই অনুভব করছি। বাঙালা সাহিত্য বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন সূর্যের মতই ভাস্বর, এ আশা অযৌক্তিক বা স্বপ্নবিলাস মনে করবার কারণ নেই। তাই মনে হয় আজ বাঙলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হরেন ঘোষ

অরাজনৈতিক

আশ্বিনের 'সমকালীনে' সমাজসমস্যা প্রসঙ্গে শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ বুদ্ধিজীবিদের রাষ্ট্রমনস্কতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো এই যে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ এবং যাঁরা স্রষ্টা বা শিল্পী তাঁরা নানাভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন, যে কারণেই এটা ঘটুক সেটা তাঁদের স্বদেশচ্যুতি বা স্বধর্মচ্যুতি। তাই "এ যুগের বুদ্ধিজীবি তাই হয় নিজে রাজনীতির খেলোয়াড়, নয়ত রাষ্ট্রে কর্মনির্বাহক—নিদেনপক্ষে তাদের প্রসাদভিক্ষু।" শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ মহাশয় এই শোচনীয় পরিস্থিতি দেখে কাতর হয়ে পড়েছেন এবং অবস্থাটা তাঁর কাছে ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। আমি তাঁর মতের সঙ্গে একমত নই একথা বল্লে কম বলা হবে—আমি তাঁর মতবাদের ঘোরতর বিরোধীতা করি। কেন করি, তাই বলছি।

ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে রাজনীতি করাটা কোন কোন মহলে ফ্যাশান ছিল—আজ রাজনীতি না করাটাই একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। অনেক ভদ্রলোককে এমন কথা বলতে শুনেছি যে রাজনীতি মানেই দলাদলি, যত রাজ্যের নোংরামী অতএব আমরা ওতে নেই। তাঁরা সব যুধিষ্ঠির ও যীশুখৃষ্টের সুসন্তান সুতরাং এই ছোটখাটো জোচ্চুরীর মধ্যে তাঁরা থাকেন না। ট্রামে বাসে, তাসের আড্ডায়, পাণ্ডিত্য অভিমানীর বৈঠকখানায় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের শ্রাদ্ধ অহরহই হচ্ছে। ভাবখানা এই যেন চুরি করাই রাজনীতি—ও পদার্থটা এতই খারাপ যেন মদ্যপান বা পতিতালয়ে যাবার মতই কাজটা অন্যায়। আমরা রাজনীতি করিনা—কথাটা বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে বলে ভাব দেখান অনেকে, যেন আমরা তার চেয়ে বড় কিছু করি। এই মনোভাব থেকেই নানা বিকৃতির জন্ম। সেই বিকৃত বিচারের অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গী হলো এই যে বিশেষজ্ঞ বা শিল্পী তাঁর নিজের কাজ নিয়ে থাকুন। রাজনীতির হাটে মাথা বিকিয়ে তার স্বদেশচ্যুতি যেন না ঘটান। তিনি শিল্পী, শিল্পের অমরলোকে পারিজাতের গন্ধে বিভোর হোন না কেন। দেশ তো তাঁর কাছ থেকে তাই চায়—কেন তিনি রাজনীতির খেলায় নামবেন। এতে দেশের যা পাবার তা তো দেশ পাবেনা। ডাক্তার ডাক্তারী করুন, বৈজ্ঞানিক তাঁর টেষ্ট্‌টিউব নিয়ে মাতাল হোন—রাষ্ট্রসমস্যা চিন্তার দায়িত্ব তো তাঁর নয়। বহুদিনের পরাধীন দেশ—বর্ণাশ্রমের সুত্রেবাধা। নতুনধরণের মানসিক জড়ত্বে আর একটা বর্ণাশ্রম গড়তে চাইছি। যে যার নিজের বিশেষ কাজে থাকো। রাজত্ব চালাবে সেই বিশেষজ্ঞরা যারা রাজনীতি পড়েছে। এটা তাদের একচেটে সম্পত্তি হোক। যারা পেশাদার রাজনৈতিক তারাই রাজনীতি করুক—তার থেকে একটা ক্ষমতালুব্ধ গোষ্ঠী গড়ে উঠুক তবু স্বাধীনচিত্ত অন্য বিশেষজ্ঞ যেন জ্ঞানচর্চায় বা নিজের বিশেষ বিষয় চর্চা ছেড়ে রাজনীতিতে না আসেন।

এই ভ্রান্তির মূল কারণ রাজনীতি সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা না থাকা। রাজনীতির বলতেই বেগে সমাজব্যবস্থার পাটোয়ারী খেলার কেন্দ্র লোকসভা বা বিধানসভাকেই অনেকেই ধরে নিচ্ছেন। রাজনীতির মাষ্টাররাও নজীর দেখাচ্ছেন অমুক বৈজ্ঞানিক কেন লোকসভার

সদস্য হলেন, অমুক ডাক্তার কেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেন, ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত কেন সংসদ পরিচালনার ভার নিচ্ছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় এই সব লোকেরা রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে উঠছেন—এই হলো অভিযোগ। কিন্তু অন্য যুক্তিতে যাবার আগে একটা কথা বলে নিই যে বণিকতন্ত্রী সমাজের বিধানসভার বাইরেও রাজনীতির একটা বিরাট ক্ষেত্র প্রসারিত আছে। সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে, সেখানে আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, সেখানে নূতন মানবসমাজ গঠনের নানা চিন্তার আদানপ্রদান চলছে। সেখানেও আমরা মনে করি যে রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ বলে কোন বিশেষ জীবের অবাধ গতায়াতই চলবে আর অন্য বিশেষজ্ঞদের গতায়াত বেআইনী এ ধারণা অশ্রদ্ধেয়। মানুষের মনের অবাধ প্রসারকে কেউ সীমা দিতে পারে না। যিনি যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যথার্থ শিল্পী তিনি কোন না কোন উপায়ে সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলির সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেনই। তাঁর মনে অতি স্বাভাবিক কারণেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে—তখনই গিওর্দানো ব্রুণোর মত জ্যোতিষবিশারদকে পুড়ে মরতে হয়, গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ হতে হয়, লুই পাস্তুরকে নিজের ছেলের উপর অজ্ঞাতপরিণাম গবেষণা চালাতে হয়, আইনষ্টাইনকে য়িহুদীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে জার্মানী ছেড়ে যেতে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরকার—ভক্ত হয়ে পড়েন, মেঘনাদ সাহা লোকসভায় নির্বাচিত হতে ইচ্ছা করেন। এগুলোকে যদি রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি প্রলুব্ধতা বলে কেউ মনে করেন তাহলে তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞতায় তিনি খুসী হতে পারেন কিন্তু বিশেষজ্ঞের দল তাঁদের অন্তর্প্রেরণায় যে পথে চলবার তাই চলবে। সমালোচকদের হাহুতাশের অগ্নি বাতাস না পেয়ে আপনার ছাইয়ে আপনি চাপা পড়বে। মানুষ সামাজিক জীব—এ সত্য সমাজতত্ত্বের অআকখ। সমাজে বাঁচতে গেলে তার মন ডালপালা মেলে চারদিকে ছড়াবেই—না ছড়ানোটাই প্রমাণ করে তার মনের স্বাস্থ্য অটুট নেই। যে মানুষের বোধশক্তি আছে সে মানুষ কেমন করে ঘরে বসে গল্প লেখে আর কবিতা আওড়ায়। তাহলে তাকে বৈষ্ণবীয় বা শাক্তজাতীয় সাধক হতে হবে—সংসারে যাই ঘটুক কৃষ্ণ বা কৃষ্ণার দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যাবেন। তাও সর্বদা হয় না—চৈতন্যকেও কাজীদমনের কাজে নামতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বারংবার রাজনীতি ধাতে সয়না বলেও সরে যেতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত সভ্যতার সংকট আর বেশ কয়েকটা কবিতা লিখে প্রমাণ করলেন যে শুধু ভারতের রাজনীতি নয় বিশ্বের রাজনীতি নিয়েও তাঁর চিন্তা। রোমাঁ রলাঁর কারাবাসের খবর কে না জানে। এমিল জোলার ড্রেফাসের ঘটনা কি প্রমাণ কর্চ্ছে? এসব ঘটনা একটা কথাই প্রমাণ করে যে প্রতিভাবান লোকের প্রতিভার সীমা বেঁধে দেওয়া আমাদের মত খুদে বহরের লোকদের এক্তিয়ারের বাইরে। যে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীর বাইরে যেতে চান না ল্যাবরেটরী যাঁর ধ্যান জ্ঞান তাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর অগাধ নিষ্ঠার জন্য তাঁকে প্রণাম করি আর যিনি বিজ্ঞানের সাধনা করেন অথচ বরিশালে বন্যা হলে ছুটে যান সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রণাম করি, শ্রদ্ধা করি, আর আপনজন জেনে ভালবাসি। তখন এ কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না যে উদ্বাস্তু লড়াই লড়তে গিয়ে মেঘনাদ সাহার প্রেরণা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লুব্ধতা।

শিল্পী, পণ্ডিত, দার্শনিকেরা কেন রাজনীতি করেন না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে যে ঐ জাতীয় লোকদের মানুষ না ভেবে মনে মনে দেবতা ভাবার কর্তাভজা প্রবৃত্তিই এর মূল। এঁদের পক্ষে রাজনীতি অনাবশ্যক। তার চেয়ে তো নিজের কাজ করে এঁরা সমাজের সেবা করতে পারেন। এই অতি তরল খোকামীর বিরুদ্ধে বলা যায় যে অন্যলোকের রাজনীতি করা উচিত কি উচিত নয়—একই লোক ভাল ডাক্তার এবং রাজনীতিজ্ঞ হতে পারে কিনা সেকথা বিচারের ভার ইতিহাস আমাদের উপর দেয়নি।

সংসারে কোনটা রাজনীতি আর কোনটা নয় সেটার হিসেবও নেওয়া দরকার। বিধানসভা লোকসভা ছাড়াও যে বিরাটায়তন দেশ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে এর বিপুল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে রাজনীতি এসে পড়বেই। ইতিহাসের ধারা থেকে কোন মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়। সেই গতির সঙ্গে তাল রাখতে হবে সবাইকেই। রাজনীতি মানেই যে মন্ত্রী হওয়া তা নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তার কোন সক্রিয় অংশকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। সে দিক থেকে সে চিন্তার দায় কেবল পেশাদার রাজনৈতিক আর রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছেড়ে রাখতে হবে এমন অযৌক্তিক কথা মানি না।

বণিকতন্ত্রী সভ্যতার পাশাপাশি সমাজবদলের যে গণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা চলেছে সেখানে সংসারের সব লোকই এগিয়ে আসছেন এবং আসবেন। আর এই সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে বিধানসভা লোকসভায়ও তাঁদের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্যে যে পেশাদারী রাজনৈতিকরা যখন সংকীর্ণ স্বার্থের অচলায়তন ভেঙ্গে বেরুতে পারবেন না তখন এই বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরাই বৃহত্তর সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। মানুষের যেটা বড় বিবেক সেটা এঁদেরই মধ্যে কার্যকরী হয়ে উঠতো এবং উঠবে।

রাজনীতির সঙ্গে যোগ না রাখার যে একটা আত্মতৃপ্ত-ভাব আমাদের বুদ্ধিজীবি মহলে দেখা যাচ্ছে সেটা মানসিক ক্লীবত্বের লক্ষণ। তারা রাজনীতির সব আলোচনাই করেন কেবল ঘাড়ে দায় চাপলেই বলেন—ওসব নোংরা ব্যাপারে আমরা নেই, রাজনীতি মানেই তো কেবল দলাদলি। যেন সংসারে আর কোথাও দলাদলি নেই। গানের আসরে, ফুটবলের মাঠে, চাকরীর অফিসে, কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে দলাদলি যে কিরকম বিকৃত অবস্থায় চলে তা সবাই জানেন। কেবল দলাদলির কথা ওঠে রাজনীতির ক্ষেত্রে, নোংরামীর একমাত্র ক্ষেত্র ওইটাই—অতএব রাজনীতি তাঁরা করেন না।

এই অরাজনৈতিক মনোভাব গড়ে ওঠবার অনেক কারণ আছে তার মধ্যে একটা হলো নিজেকে সংসারে খুব নীতিবাদী বলে প্রচার করা। যে লোক কান্টমস্ অফিসে, করপোরেশন অফিসে, রেলে কেবলই ঘুষ খায়, যে লোক চোরাকারবারে ধনী হয়েছে তারাই দেশটা উচ্ছন্নে গেল বলে দোষ চাপাচ্ছে রাজনীতিজ্ঞদের ঘাড়ে। রাজনীতি না করার উল্লাসিক ফ্যাশন সেই মহলেই প্রবল সংসারে কোন নীতির বোঝাই যাদের ঘাড়ে সয় না। রাজনীতির পিছনে কোন না কোন একটা আদর্শ কাজ করছে—আর সেই আদর্শকে বাস্তব করার জন্য জনসংযোগেরও দরকার করে। যারা এদুটোর কোনটাকেই বরদাস্ত করেন না তাঁদেরই ঘরে বসে তর্কের ভোঁতা নাচের তাল কাটবে আর টেন্টাটিউব ফাটবে—ফলে সমাজের প্রভূত ক্ষতি। বিশ্বের আকাশে এখানে সেখানে ঘনায়মান যুদ্ধের কালো মেঘ একটু একটু করে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় বৈজ্ঞানিকেরা যদি বলেন—অ্যাটম বোমা আমরা গড়েছি তার ব্যবহার আমরাই নিয়ন্ত্রণ করবো—তাহলে খুব রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লুব্ধতা প্রকাশ পাবে কি। কেউ যদি মনে করেন এতে প্রতিভা স্বদেশচ্যুত হবে তাহলে বলবো যে হয় হোক, কিন্তু প্রতিভা স্বধর্মচ্যুত হয়নি। অরাজনৈতিকের ভণ্ডামীর ভেক ফেলে তাঁরা যে মানবকল্যাণে রাজনীতির খেলোয়াড় হতে নেমেছেন তার জন্য মানব সমাজ কৃতজ্ঞ থাকবে। এর জন্যে তাঁদের রাষ্ট্রপতিদের প্রমোদভিক্ষু বলা শুধু অশালীনতা নয় বালসুলভ মাত্রা-অজ্ঞতা।

সোমেন বসু

স মা লো চ না

আমেরিকার সাহিত্য জগৎ

কেউ যদি বলেন সাহিত্যিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ধরলে সত্যি সত্যি সার্থক ব্যবসায়ী হতে পারবে। এমন কথা আমরা চট করে হয়তো বিশ্বাস করতে পারবো না। কিন্তু ব্যবসার দেশ আমেরিকার সংগ্রহ তথ্যে অনেক অবাক করা খবর পাবো। সম্প্রতি প্রকাশিত সমালোচক ম্যালকম কাউলের' রচনা "দি লিটারারী সিচুয়েশন"* নামক বইতে মার্কিণ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অনেক অন্তরঙ্গ খবর পাওয়া যাবে। কাউলে বলেছেন সাহিত্যিকদের কল্পনা প্রবণ মনে চিন্তার প্রসার নাকি অনেক অদ্ভুত কাজই করতে পারে। কাউলে উল্লেখ করেছেন কেনেথ থার্ক নাকি ব্যবসা জগতের অনেক পরিসংখ্যান বিচার করে দেখিয়েছেন যে,

It is possible that many corporations might profit by having a writer on the board of directors, to suggest new policies.

আমাদের দিশি সাহিত্যিকদের কাছেও এ আশার কথা। থার্ক সাহেব তাঁর এই মতামত সাধারণভাবে সকল দেশের সাহিত্যিকদের প্রতি প্রযোজ্য বলেই বলেছেন। তাঁর মতে কোন পণ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে, বা নতুন পথে বাণিজ্য বিস্তারের উপায় নির্ধারণে, সাহিত্যিকদের কল্পনা অধিকাংশ সময়ে অসার্থক হবে না।

লেখকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেক আগ্রহ আছে। অনেক কৌতূহল আছে। সাহিত্যিকদের সামাজিক আচার আচরণ অনেক সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো অদ্ভুত ঠেকে। মূলত ভাবপ্রবণতাই এর জন্য দায়ী। কারণ, ভাব প্রবণতা সব মানুষেরই কিছু না কিছু থাকে — আর, সাহিত্যিকদের থাকে একটু বেশিই। তবু তারাও সাধারণ মানুষের মত অবশ্যই কর্মপ্রবণ, ডিউটিফুল, এবং সামাজিক জীবও। পেশাগত জীবনের দিকে তাকালে তাদের জীবনের দৈনন্দিন অনুভূতির বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। যেমন অনেক সময়ে, লেখকদের অন্যমনস্কতা বা চিন্তান্বিত ভাব অনেকের কাছে অহেতুক ঠেকতে পারে কিন্তু এ ধরণের মানসিক অবস্থার সত্যিকারের পরিবেশ তলিয়ে দেখা উচিত। 'দি লিটারারী সিচুয়েশনের' লেখক বলছেন :

Sometimes he is absentminded and a little helpless for several months while he is writing a book, though at other times he may prove to be a hard headed man of affairs. After he had finished the book or even a magazine article—he does not want to talk or listen for a while, but merely to be told that what he has done is wonderful and unique.

সাহিত্যিক-কবিদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যাবে মার্কিণ সমালোচক 'ম্যালকম কাউলের' এই বইতে। বিশেষ করে মার্কিণ সাহিত্যিকদের

*The Literary Situation: Malcom Cowley. Pub: Andre Deutsch, London, 21s.

সম্পর্কেই। কোন এক মার্কিণ সমালোচক নাকি মত প্রকাশ করেছেন, সাহিত্যিকেরা সত্যি সত্যি কারুর প্রেমে পড়েন না, যেখানে কোনো প্রেমের উদাহরণ চোখে পড়ে তলিয়ে দেখলে তার আসল স্বরূপ ধরা পড়ে যাবে। সত্যিকার প্রেমের থেকে প্রেমের অভিনয়ে সাহিত্যিকেরা বিশেষ পটু। অবশ্য এই মত পুরোপুরি সমর্থন করেন না কাউলে সাহেব। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য খবর তিনি পরিবেশন করেছেন। আমেরিকার নগরবাসী ছোকরা সাহিত্যিকেরা ডিভোর্স করে অনেক বেশী। ছায়াছবির অভিনেতাদের মত অত ঘনঘন না হলেও সংখ্যাটা পরিমাণে একটু বেশীই হবে। তবে প্রবীন সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সসম্ভ্রমে তিনি বলেছেন,

The divorce rate is very low among older writers in the country, where it is hard to live alone and where divorce not only breaks up a household but also for one partner and sometimes for both, destroys a way of life.

আবার লেখিকাদের মধ্যে ডিভোর্স রেট আরো বেশী। ছোকরা সাহিত্যিকদের চেয়েও। বিশেষ করে যে সব লেখিকার বয়স চল্লিশেরও কম। যৌন জীবন সম্পর্কে কিছু দুর্নাম ছড়ালেও কিছু সুনামও কাউলে সাহেব স্বীকার করেছেন। যেমন বলেছেন, লেখকদের বিবাহিত জীবন যদি কোনক্রমে টিকে যায় তবে তাদের দ্বৈত পার্টনারশিপ সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের চেয়েও গভীরতর হয়।

নিউইয়র্কের মতন শহরে লেখকদের কোন কফি-হাউসের জীবন নেই। বিলাতের কবি স্টীফেন স্পেণ্ডার নিউইয়র্কে গিয়ে কিছুটা দুঃখই পেয়েছিলেন। সাহিত্যিকদের সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধতার অভাব তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল। মার্কিণ সাহিত্যিকেরা অত হৈ হল্লা পছন্দ করেন না — বিশেষকরে প্যারির সাহিত্য সমাজের মত। পারিবারিক জীবনে তাঁরা খুব শান্তিতে থাকতে চান। এমন কি শহরবাসী হলেও শহর থেকে দু এক মাইল তফাতে থাকাই সুখের বলে মনে করেন। লণ্ডনে সাহিত্যিকদের ক্লাব, প্যারিতে কফি হাউস, সাহিত্যিকদের সামাজিক মেলামেশা গভীরতর করে তোলে।

সম্প্রতি ৫০টি প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য মার্কিণ যুদ্ধোপন্যাস কাউলে সাহেবকে পড়তে হয়েছে। এর ফলে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধকালীন উপন্যাসগুলির সঙ্গে এদের এক তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তিনি দেখেছেন, এ যুদ্ধের উপন্যাসে সেক্সের প্রাধান্য বেশী। হেমিং ওয়ের মতে নাকি এ যুগের উপন্যাসগুলো গত যুগের থেকেও শিল্পসমৃদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের লেখকদের করুণ হাহাকার বিধৃত রয়েছে তাদের কাহিনীতে। কিন্তু এযুগের গল্পে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সচেতনতা আছে নামমাত্র। যুদ্ধ যেন প্রাত্যহিক জীবনেরই এক ঘটনা। একে মেনে নেওয়াই হল শিল্পীসুলভ সততা। প্রথম মহাযুদ্ধের উপন্যাসগুলিতে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনীতে প্রবীন মার্কিণ লেখকদের ছাপা সুস্পষ্ট। ডস্ পাসোস্, হেমিং ওয়ে, স্টাইনবেক এরাই হলেন গুরুস্থানীয়।

আমেরিকার বইয়ের বাজার আজ দখল করে আছে পকেট বুক জাতীয় সস্তা দামের বইগুলো। বইয়ের দোকানগুলি ছাড়াও আরো নানা জায়গায় এসব বইয়ের বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পত্র পত্রিকার স্টলে, বারে, রেস্টুরেন্টে, ভ্যারাইটী স্টোরে, এমন কি ড্রাগ স্টোরেও এদের বিক্রির ব্যবস্থা আছে। খণ্ড কার্টুনের বই, ঐতিহাসিক রোমান্স, তীব্র যৌন উপন্যাস, কবিতা সংকলন, আমেরিকান ক্লাসিক, আধুনিক ফরাসী সাহিত্য— এদেরই ভীড় বেশী। অবশ্য প্রত্যেকটা বইয়েরই খুব চটকদার কভার পেজ। এ সবই আজ লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। এর ফলে কিছু কিছু পত্রপত্রিকার বিক্রি কমে গেছে। কাউলে সাহেব লক্ষ্য করেছেন, দুই কি

তিন কপি বই বিক্রি হওয়ার পরেও এক কপি সাময়িক পত্রিকা বিকোয় কিনা সন্দেহ।

আগামী ৫০ বছরের মার্কিণ সাহিত্য কীরূপ নেবে তার আলোচনা করতে গিয়ে লেখক কিছুটা হতাশ হয়েছেন। তিনি বলছেন, নতুন যুগের সাহিত্যে নতুন চিন্তা আবেগের স্পর্শ কই? নতুন জীবনবোধের ছায়াপাত না ঘটলে ৫০ বছরে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয়তো পাওয়া যাবে না। তাঁর মতে এক যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রভাব নতুন জীবনবোধের উন্মেষে বাধা দিচ্ছে। হেমিং ওয়ে, ডস্ প্যাসোস্‌দের প্রভাব নতুন সৃষ্টির পথে আজ ক্ষতিকর। বোদলেয়র বা ডস্টয়ভস্কির প্রতিভায় একদা যে যুগের উদ্বোধন ঘটেছিল — আজ তা গতপ্রায়। তাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মোহে নতুন ধরণের সৃষ্টি সম্ভব হবে না। বিশ দশকের হেমিংওয়ে বা ফকনারের মত নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী প্রতিভাবান শিল্পীর আগমন তিনি কামনা করছেন। সাহিত্যের পথে অনেক আবর্জনা জমেছে। এসব দূর করার কাজে কে নেতৃত্ব দেবে? সেই প্রতিভাবান সাহিত্যিক কই যিনি স্বল্প ক্ষমতাবান লেখকদের তাঁর জীবনবোধে, শিল্প দৃষ্টির গভীরতায় চম্বুকের মত আকর্ষণ করে রাখবেন?

মার্কিণ সাহিত্য জগতের এখন শীতকাল। নববসন্তের জন্মলগ্নের হয়তো দেরী নেই।

মুরারি ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ॥ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। মূল্য ৩ টাকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের ঘটনাবলী আজ আমরা ভুলতে বসেছি। রাজা রামমোহন ছাড়া এই সময়ের আর সকলেই আজ নাম মাত্রে পর্যবসিত। শ্রীরামপুর মিশনারীরা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা আজ শুধু ইতিহাসের সামগ্রী, তাঁদের রচনাবলী প্রায় মিউজিয়ামের বস্তু হয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যের কথা কিছুকাল ধরে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের দৃষ্টি পড়েছে এই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়টির দিকে, এবং গবেষণার দ্বারা বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করে জনসাধারণের সামনে যাঁরা এনে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর সুশীল দে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, যোগেশ বাগল, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম সহজেই মনে পড়ছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ সেই অনুসন্ধানেরই আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের যে রূপ আমরা পেয়েছি, বাংলা গদ্যে ভাবপ্রকাশের জন্য গদ্যভঙ্গীকে সচেতন ভাবে গড়ে তোলবার যে চেষ্টা দেখেছি, তার সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে লেখক আমাদের ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। ফলে কৌতূহলী পাঠকের বহু কৌতূহলের শুধু নিরসনই হয়নি নতুনতর কৌতূহলে মন ভরে উঠেছে। ইতিহাসের উজান বেয়ে মন চলে গেছে আসাম কুচবিহারের রাজদরবারগুলিতে যেখানে বাংলায় পত্রালাপ ছিল রীতি; মনে ছবি জেগে উঠেছে শাসাশ্যামলা পূর্ববাংলার যেখানে পর্তুগীজ মিশনারীদের হাতে পড়ে খৃস্টান হওয়া ডোম এণ্টনিওর চেষ্টায় বহু লোক খৃস্টান হয়েছে। ইতিহাসের যে বিরাট পশ্চাৎপট লেখক বহু মূলবান তথ্য সহযোগে সাজিয়ে তুলেছেন তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্য।

সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে এ গ্রন্থ মূল্যবান। শুধু তালিকা রচনা করে লেখকের কর্তব্য পালন শেষ হয়নি। প্রত্যেকটি গ্রন্থের পিছনে লেখক তার জন্মকাহিনী দেবার চেষ্টা করেছেন সে কাহিনী শুধু লেখকের পরিচয় নয় বা গ্রন্থ রচনার তারিখ নয়। কোন মনোভাব সেই গ্রন্থের প্রেরণা, তা ব্যক্তিগত না গোষ্ঠীগত, এই সব দুরূহ প্রশ্নের বিশ্লেষণ লেখক যথাসাধ্য করেছেন। এ গ্রন্থকে শুধু ইতিহাস বলে দেখলেও অবিচার করা হবে। সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ হিসাবে এ গ্রন্থ মূল্যবান। পূর্বসূরীদের মতামত লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন এবং তথ্যের সমর্থন না পেলে সেগুলিকে বাতিল করার সাহসও দেখিয়েছেন। নিজের লেখাকে প্রামাণ্য করে তুলতে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় আগাগোড়া মিলবে। একথা সহজেই স্বীকার করতে হবে যে (কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে একমত না হলেও) লেখকের মন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথ ধরে চলেছে এবং নিজের বিষয়বস্তুকে নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিচার করেছেন।

সর্বশেষে একটা কথা বলতে চাই। বইটি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে লেখকের মনোযোগ তথ্যসন্ধানে ও তাদের সততা প্রমাণে এত বেশী আকৃষ্ট, যে গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা যে কেবল পণ্ডিতেই পড়বে এ ধারণাটা বোধহয় সত্য নয়। লেখক নিশ্চয় জানেন যে যাঁদের মনের ভাবনাচিন্তা তাঁরই মত গভীরতা লাভ করেছে, তারা ছাড়া এ গ্রন্থের আর কেউ পাঠক হবে না। তাঁর রচনাভঙ্গীর আড়ষ্টতা ও জটিলবাক্যবিন্যাসের প্রাণালী সাধারণ পাঠককে ঠেকিয়ে রাখবে বিষয়বস্তুর প্রভূত আকর্ষণ সত্ত্বেও। লেখকের বাচনভঙ্গী যদি আরও সরল হোতো তাহলে বিষয়বস্তু ও তাদের আলোচনার রূপ আরও খুলতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনার পর একথা মনে করার অবকাশ নেই যে গম্ভীর বিষয় ততোধিক গম্ভীর ভাষার আড়ম্বরে প্রকাশ করতে হবে। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে আমার এই আপত্তির প্রমাণস্বরূপ তিনটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি—

১। পৃঃ ৮০—আলোচ্য তের বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস শঙ্কাপূর্ণ মন্থরতায় স্থবির।

২। পৃঃ ৯৪—দৈনন্দিন জীবন হইয়া পড়িয়াছিল উদ্ভবৃত্তির পুনরাবৃত্তি।

৩। পৃঃ ১২১—চিত্তের যে জাতীয় জাতীস্মরতা ও ভাবী অভিজ্ঞতা থাকিলে একটা জাগরোন্মুখ জাতিকে নবজীবনের উষ্কাস্মুখর প্রাঙ্গণতলে উপস্থাপিত করা যায় তাহার পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

তৎসত্ত্বেও এ গ্রন্থ সঞ্চয় করে রাখবার মতো—যারা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র তাদের তো বটেই সাধারণের পক্ষেও।

মঞ্জুলিকা বসু

সমকালীন

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি :

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক যান্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

লেখকের প্রতি :

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, **কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।** দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশকদের প্রতি :

'সমকালীনে' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য
ফোন : ২৩-৫১৫৫